প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Bureau of The University Grants Commission

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

ESO - III
(PAPER - III)
(SOCIOLOGICAL THOUGHT)
MODULE - 2

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences.
Netaji Subhas Open University (NSOU).
Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt.of Sociology.
University of Calcutta.
Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology. University of Calcutta.
Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology.
NSOU.
Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt.of Sociology.
NSOU.
Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology.
Presidency University.
Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology, Vidyasagar University
Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology.
NSOU.
Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Soiciology.
NSOU.

: Writer :
Dr. Soheli Guha Neogi
Assistant Professor in Sociology
Adamas University

: Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology, NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this study material may be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO - III

Module - 2 : Sociological Thinkers - I

Paper III

পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ্ - I

পর্যায়—২ : পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ্

একক-১ ❑ অগাস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) **10-22**

একক-২ ❑ হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩) **23-35**

একক-৩ ❑ কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) **36-56**

একক-৪ ❑ এমিল দুর্খাইম (১৮৫৮-১৯১৭) **57-80**

পর্যায়—২ : পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ্ - I

১. উদ্দেশ্য
২. প্রস্তাবনা
৩. একক—১ অগাস্ত কোঁত
একক---২ হার্বার্ট স্পেনসার
একক---৩ কার্ল মার্ক্স
একক---৪ এমিল দুমাইল
৪. সারাংশ
৫. অনুশীলনী
৬. উত্তরমালা
৭. গ্রন্থপঞ্জী

১. উদ্দেশ্য:

এই পর্যায়টি পাঠ করলে—

- সমাজতত্ত্বের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ্দের অবদান জানা যাবে
- বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজের পঠনপাঠন ও নির্মাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্দের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাবে
- সমাজ বিবর্তন ও প্রগতির তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন হবে
- বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভিত্তিতে সমাজকে বোঝা যাবে
- সমাজের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বোঝা যাবে
- সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো যুক্তিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ভাবনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে
- সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি বোঝা সম্ভব হবে।

প্রস্তাবনা:

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বকেই সমাজতত্ত্বের সূচনাকাল বলা হয়। এই সময় পশ্চিমইউরোপে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখা যায়। ঐসব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল। শিল্পবিপ্লব চলাকালীন পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাশীল মানুষের নানাবিধ নতুন সমস্যা ও তাদের গুরুত্বকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করে তাদের বিচার বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনে ফরাসী চিন্তাবিদ্‌রা অগ্রগণ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির চিন্তানামকরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সমাজবিজ্ঞান—অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজবিষয়ক চর্চা—এই ধারণাটির জন্ম পশ্চিম ইউরোপ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ফরাসী চিন্তাবিদ্ অগাস্ত কোঁত এই বিশেষ বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি বিজ্ঞান এবং সামাজিক ঐক্য ও উন্নয়নের সূচক এই বিজ্ঞান—এই দৃষ্টিভঙ্গী কোঁত এবং পশ্চিত্বম ইওরোপের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের তত্ত্বে উঠে আসে এবং এদের সমাজবিজ্ঞানের স্থপতি বলে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজের পঠনপাঠন ও নির্মাণ সম্পর্কে পশ্চিম ইওরোপের আধিপত্য স্বীকৃত।

সর্বপ্রথম 'সমাজতত্ত্ব' নামটি চয়ন করেছিলেন অগাস্ত কোঁত। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণের বহু আগেই শাস্ত্রটির জন্ম হিয়েছিল শিল্পবিপ্লব ও অন্যান্য সমাজবিপ্লবের পরিণতিস্বরূপ। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি ফ্রান্স ও জার্মানীতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তার প্রসারে সাহায্য করেছে। শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক, সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। আর এই সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে।

সামাজিক বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিক পরিচয় সুদূর অতীতে পাওয়া গেলেও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান-ধারণা গঠন শুরু হয় ফরাসী চিন্তানায়ক সমাজতত্ত্বের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং ফরাসী বিপ্লবের মহান সন্তান সাঁ সিমো (Saint-Simon) উত্তরসূরী অগাস্ত কোঁত-এর সময় থেকে, মানুষের জ্ঞানবিকাশের প্রকৃতি অনুধাবনের সূত্র নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি সমাজের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য Positive Philosophy নামক গ্রন্থে প্রথমে Social Physics এবং পরবর্তীকালে Sociology বা সমাজতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে দু-ভাগে বিভক্ত করেন— সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতি। কোঁত একজন প্রত্যক্ষবাদী (positivist) সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞানে অবৈজ্ঞানিক যুক্তি, ধ্যানধারণা ও সিদ্ধান্তের কোন স্থান নেই এবং তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতেই সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা

রচনায় কোঁতের ত্রিস্তর বিধি এবং প্রগতিত্ব বিশেষ বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করে। বর্তমান পর্যায়ে ১ নং এককে অগাস্তকোঁতের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হল। প্রকৃত প্রস্তাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে তা প্রতিষ্ঠা পায়। এইসময় বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেনসার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিবর্তনবাদী এবং সমাজতাত্ত্বিক। সমাজবিজ্ঞানকে তিনি সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করার বিজ্ঞান হিসেবে মনে করেন এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের সমকালীন মূল্যবোধ ও ধারণার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালান। তিনি মনে করতেন জীবজগতের বিবর্তনের মত সামাজিক পরিবর্তনও হল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াবিশেষ। বর্তমান পর্যায়ে, ২ নং এককে স্পেনসারের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচিত হল।

কোঁত, স্পেনসার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের যে ধারা বর্তমান ছিল, কার্ল মার্ক্স-এর সমাজতত্ত্ব তা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স এক নতুন চিন্তাভাবনার সূচনা করেন। মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব চর্চার মূলে ছিল সমাজের পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা। ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাধারা ছিল তাঁর আলোচনায় অন্যতম দিক। সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব এবং ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পরিবর্তন বর্ণনা করেছেন। এই পর্যায়ের ৩ নং এককে কার্ল মার্ক্স-এর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচিত হল।

সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে আরেকজন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন এমিল দুর্খাইম। কোঁত সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির সূচনা ও প্রবর্তন করলেও বিষয়টিকে উৎকর্ষতা দান করেন দুর্খাইম। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে তুলনামূলক চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালান। সমাজের গঠন, সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন। সমাজতত্ত্বের কার্যনির্বাহী তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন দুর্খাইম, তাঁর চারখানি গ্রন্থ, শ্রমবিভাজন (The Division of Labour), আত্মহত্যা (Suicide); সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিবিদ্যা (The Rules of thye Sociological Method) এবং ধর্মতত্ত্ব (The Elementary Forms of Religious Life) গ্রন্থসমূহ গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। তাঁর সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা (Social fact) এর ধারণা সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৪নং এককে দুর্খাইম সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হল।

একক-১ ❑ অগাস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭)

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ অগাস্ত কোঁতের সমাজতত্ত্ব চর্চা

১.৩.১ বিবর্তন ও প্রগতির তত্ত্ব

১.৩.২ বিজ্ঞান সমূহের ক্রমোচ্চবিন্যাস

১.৩.৩ প্রত্যক্ষবাদ

১.৩.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ উত্তরমালা

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য:

এই একক পাঠ করলে যা বোঝা যাবে তা হল—

- সমাজতত্ত্বের জনক কোঁতের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা জানা যাবে
- সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হবে
- সামাজিক বিবর্তন ও প্রগতির তত্ত্ব বোঝা যাবে
- সমাজের স্থিতি ও গতিময় অবস্থান সম্বন্ধে জানা যাবে
- সর্বোপরি কোঁতের বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণ বোঝা যাবে

১.২ প্রস্তাবনা:

সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনে যে ফরাসী চিন্তাবিদের অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন অগাস্ত কোঁত। ১৮৩০ সালে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে "Positive Philosophy" নামক গ্রন্থে প্রথমে "Social Physics" এবং পরবর্তীকালে "Sociology" বা সমাজতত্ত্ব কথাটি কোঁত

ব্যবহার করেন। শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সূচনা হয়। কোঁত প্রত্যক্ষবাদী সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তিনি মনে করতেন যে, সমাজবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার মত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ হবে এবং সমাজবিজ্ঞান মানবজাতির উদ্ভব ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করবে। কোঁত, সামাজিক বিবর্তন ও প্রগতির তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এবং পর্যায় ভিত্তিক বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় জটিল হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। বর্তমান এককে কোঁতের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত হল।

অগাস্ত কোঁতের সমাজতত্ত্ব চর্চা:

অগাস্ত কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। সমাজতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগাস্ত কোঁতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম "সমাজতত্ত্ব" (Sociology) শব্দটি ব্যবহার করেন। ফরাসী বিপ্লবোত্তর সমাজে জন্মগ্রহণ করায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার রূপ দর্শন করেন এবং সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমাজ সম্বন্ধে এক তত্ত্বগত এবং বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র গঠনে ব্রতী হন।

১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ার (Montpellier) শহরে অগাস্ত কোঁত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লুইস অগাস্ত কোঁত (Louis Auguste Conte, যিনি সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং মাতার নাম ফেলিসাইট রোসালিয়ে (Felicite Rosalie). তার পরিবার মূলত রক্ষণশীল ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তবে কিশোর বয়স থেকেই কোঁত পারিবারিক ধর্ম ও রাজনীতির পথ সযত্নে ত্যাগ করার চেষ্টা করেছেন। ১৮১৩ সালে প্যারিসের বিখ্যাত ইকোলি পলিটেকনিক (Ecole Polytecqnique) এ পড়ার সুযোগ পান কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য তাঁকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং মন্টপেলিয়ারে পাঠিয়ে দেয়। এখানেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয়। পরবর্তীতে কোঁত আবার প্যারিসে ফিরে যান এবং সেখানে সাঁ সিমঁ-র ভাবধারা কোঁতকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৫৭ সালে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

১.৩.১ বিবর্তন এবং প্রগতির তত্ত্ব (Theory of Evolution and Progress)

সমাজ বিকাশের কারণ সম্পর্কে কোঁত এর অভিমত হল সমাজে বৌদ্ধিক পরিবর্তন আসে জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে। আর বস্তু জগতের পরিবর্তন আগে জ্ঞানের উন্নতি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাঁর মতে, মানুষের সকল চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞানের সকল শাখা এবং পৃথিবীর সকল সমাজ বিভিন্ন স্তরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা অর্জন করে।

ত্রিস্তর বিধি (Law of Three Stages)

সামাজিক ভাবধারা এবং সমাজবিজ্ঞান সৃষ্টির রচনার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ-এ বিশ্বাসী কোঁত-এর সামাজিক বিবর্তনের ত্রিস্তর বিধির আলোচনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৮২২ সালে এই বিবর্তন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলেন তিনি। ত্রিস্তর বিধির ধারণার ক্ষেত্রে কোঁত সাঁ সিমোঁর কাছে ঋণী। সাঁ সিমোঁর লেখায় উল্লেখিত ধারণাকে জানতে আরও সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করেন। তাঁর System of positive polity নামক গ্রন্থে ত্রিস্তর বিধি আলোচনা করেছেন।

কোঁতের মতে সমাজে পরিবর্তন মানে বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং এই বৌদ্ধিক বিকাশের তিনিটি স্তরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

১. ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stages)

২. আধিবিদ্যক স্তর (Metaphysical Stage)

৩. বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষবাদী স্তর (Positive Stage)

১. ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage)

কোঁতের মতে, মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের এটিই প্রথম স্তর। জ্ঞানদীপ্তির পূর্বকালীন সমাজে মানুষের অস্তিত্বের উপর ঈশ্বরের প্রভূত্ব কায়েম ছিল। সমাজে মানুষের অবস্থান নিয়ন্ত্রিত হত ঈশ্বর এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে। যাবতীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাসমূহের প্রকৃতি, উৎস ও উদ্দেশ্যের খোঁজার জন্য মানুষ ধর্মীয় ব্যাখ্যা উপর নির্ভরশীল ছিল। মানুষ প্রত্যেক ঘটনার পিছনে কোন না কোন অলৌকিক শক্তির কল্পনা করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ বিদ্যুৎ চমকানো, মেঘের গর্জন, গাছ-পালা, নদীপ্রবাহ, দিনরাত, প্রেম-প্রীতি সবকিছু জৈবিক শক্তির আত্মপ্রকাশ বলে মনে করতেন। এই স্তরে সমাজ গঠন ও পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি হল ধর্ম। এই স্তরকে আবার তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—

ক) নিয়তিবাদ বা ভাগ্যবাদ (Fetichism) : এই স্তরে মানুষের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে এবং ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে প্রাণবন্তরূপে বিবেচনা করে।

খ) বহুঈশ্বরবাদ (Polytheism) : এই স্তরে বিশ্বাস করা হত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহুবিধ কাল্পনিক দেবতা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই সময়ে মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ দেব-দেবীর কল্পনা করা হত ফলে বহুঈশ্বরবাদের জন্ম হয়।

গ) একেশ্বরবাদ (Monotheism) : যখন থেকে মানুষ মেনে নেয় যে, সংসারের প্রত্যেক ঘটনার সঞ্চালক একজন ঈশ্বর এবং সবকিছু তার দ্বারা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয় তখন একেশ্বরবাদের জন্ম হয়।

এই স্তরে মানুষের চিন্তা গভীর, সূক্ষ্ম হয়ে যায়, ফলে মানুষ বহুঈশ্বরের উপরে আস্থা হারিয়ে একঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন

সমরভিত্তিক সমাজ (Militaristic Society) : মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের তিনটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিন ধরনের সমাজের কথা বলেন। মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ হল সমরভিত্তিক সমাজ। এই সময় বৌদ্ধিক বিকাশ ও সমাজের প্রকৃতির মধ্যে গভীর সমন্বয় ছিল। প্রকৃতিগত বিচারে উভয়ই ছিল প্রভূত্ব ভিত্তিক। এই সময় জ্ঞানের ব্যবহার ছিল ধর্মভিত্তিক এবং সমাজ ছিল সমরভিত্তিক।

এই স্তরে সামাজিক একক ছিল পরিবার। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সংযুক্ত। মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। মুখোমুখি, আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ছিল পরিবার।

প্রত্যক্ষবাদী স্তর (Positivistic Stage) : প্রত্যক্ষবাদী বা বৈজ্ঞানিক স্তর হল তৃতীয় এবং চূড়ান্ত স্তর। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর এর এবং অধিবিদ্যক স্তরের অনুমান নির্ভরতা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে মানুষ বিজ্ঞানসম্মত এমন প্রাকৃতিক সূত্রের অনুসন্ধান করে যার দ্বারা সমাজের প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাগুলি বোঝা যায়। এই স্তরে সমাজ বৈজ্ঞানিক অবস্থা অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের স্তরে চলে আসে। এই স্তরে মানুষ যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঘটনার শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতে ঘটনা এবং তথ্য জানার চেষ্টা করে। এই সময় গুরুত্ব আরোপ করা হয় বিষয়গত (objective) এবং সামাজিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের উপর।

শিল্প সমাজ (Industrial Society) : প্রত্যক্ষবাদী স্তরের সাথে শিল্পনির্ভর সমাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যক্ষবাদী স্তরে শিল্পনির্ভর সমাজের সূত্রপাত ঘটে। এই সময় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ ঘটে, সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয় ফলে সামরিক মানসিকতা দুর্বল হতে থাকে।

এই স্তরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রযুক্তির প্রাধান্য পায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি এবং বৈজ্ঞানিকদের নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

কোঁত ত্রিস্তর বিধির বিবর্তনমূলক সূত্রের মধ্যে দিয়ে সামাজিক প্রগতির তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তিনি মানবজাতির উন্নতির একটি ছক কষে দিয়েছিলেন যে ছক অনুসারে ব্যক্তিমন, মানবমন ও মানবসমাজ অগ্রসর হয়ে শেষে প্রত্যক্ষবাদী স্তরে পৌঁছায়।

কোঁতের মতে, মানুষের কর্মোদ্যোগ আগ্রাসী যুদ্ধের স্তর থেকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং তারপর শিল্প প্রতিষ্ঠার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

২. অধিবিদ্যক স্তর (Metaphysical Stage)

দ্বিতীয় স্তর হল অধিবিদ্যক স্তর। মোটামুটি ১৩০০ সালে দ্বিতীয় স্তরটির সূত্রপাত ঘটে। অধিবিদ্যা বলতে বোঝায় যুক্তির মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে নয়; সৃষ্টির বিশ্লেষণ, এই স্তরে সমাজের সকল ঘটনার কারণ হিসেবে প্রকৃতির ভূমিকা বুঝতে শেখে মানুষ। মানুষের চিন্তাধারা দেবতা কেন্দ্রীক না হয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে নেমে আসে। এই সময় প্রকৃতির নিয়মাবলী ও প্রকৃতির প্রদত্ত অধিকারের ধারণা বিকাশ পায় এবং বিস্তার লাভ করে। এই স্তরে দেবতা বিষয়ক ধারণা অধিবিদ্যক ধারণায় রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন বিসৃত নীতি, প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারের ধারণা এই সময় প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

আইননির্ভর ও বিধিবদ্ধ সমাজ (Legalistic and Formal Society) : এই স্তরে সমাজ মূলত আইননির্ভর। এই ধরনের সমাজে বিধিসম্মত সুসংগঠিত শাসনের সৃষ্টি হয়। এই সমাজে আর্যবিদ এবং কুটনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা চলে আসে।

এই স্তরে সামাজিক একক হিসাবে পরিবারের বদলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হত। এই সময়ে সমাজে শৃঙ্খলার বিষয়টি আর ব্যক্তি পর্যায়ে না থেকে সমষ্টিতে পরিণত হয়।

কোঁত অগ্রসরমান সমাজের উদ্ভবের দীর্ঘ আলোচনায় ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন স্তর—

বৌদ্ধিক, মানুষের বস্তুগত জীবনের বিকাশ, সামাজিক এককের, সামাজিক শৃঙ্খলার এবং বিদ্যমান মনোভাবসমূহের মধ্যে সহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সহ সম্পর্কগুলি হল—

বৌদ্ধিক স্তর	মানুষের বস্তুগত জীবনের বিকাশের স্তর	সামাজিক এককের স্তর	সামাজিক শৃঙ্খলার স্তর	বিদ্যমান মনোভাব
ধর্মতাত্ত্বিক ১. নিয়তিবাদ ২. বহুঈশ্বরবাদ ৩. একেশ্বরবাদ	সমরভিত্তিক	পরিবার	পারিবারিক	পারস্পরিক আকর্ষণ
আধিবিদ্যক	আইনভিত্তিক	রাষ্ট্র	সমষ্টিগত	ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা
প্রত্যক্ষবাদ	শিল্পভিত্তিক	সমগ্র মানবতা	সার্বজনীন	দয়া ও অপরের উপকারের মানসিকতা

১.৩.২ বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাস (Hierarchy of Sciences)

অগাস্ত কোঁত তাঁর 'Course de Philosophic Positive' গ্রন্থে বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাসের তত্ত্ব বর্ণনা করেন। সমাজতত্ত্বকে একটি নবীন বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করার উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাসের তত্ত্ব রচনা করেন। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল নিয়মতান্ত্রিক সমাজ পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। জগতের প্রতিটি জিনিসই কোন না কোন নিয়মের অধীন। সেই নিয়মটি কি সেটা তিনি আবিস্কার করেন। কোঁত সকল বিজ্ঞানের বিকাশের পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিস্থাপিত করেন এবং বিজ্ঞানের উচ্চতা বা নিম্নতার উপর ভিত্তি করে একটি স্তর তৈরী করেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রত্যেক বিজ্ঞানের উন্নতির পরিস্থিতিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি মূলতঃ সমাজতত্ত্বকে নবীনতমও জটিলতম বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় ব্যাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। 'ত্রিস্তর বিধি' এবং 'দৃষ্টিবাদ' এর পরে বিজ্ঞান সমূহের ক্রমোচ্চবিন্যাস কোঁতের তৃতীয় অবদান।

ক্রমোচ্চ বিন্যাসের ভিত্তি :

কোঁত বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাসের জন্য প্রধান দুটি নীতির কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

১) নির্ভরতা বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়ের নীতি (Principle of order of Increasing dependency)

২) ক্রমহ্রাসমান সার্বজনীনতা এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতার নীতি (Principle of Decreasing Generality and Increasing Complexity)

১) নির্ভরতা বৃদ্ধি ক্রমপর্যায়ের নীতি : কোঁতের মতে, জ্ঞান বা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা তার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক নতুন বিজ্ঞান তার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয় এবং যে বিজ্ঞান যত বেশি পূর্ববর্তী বিজ্ঞানগুলির উপর নির্ভরশীল, সেই বিজ্ঞান তত বেশি নবীনতম বিজ্ঞান।

২) ক্রমহ্রাসমান সার্বজনীনতা এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতার নীতি : কোঁতের বিজ্ঞান সমূহের ক্রমোচ্চ বিন্যাসের দ্বিতীয় নীতিটি হল ক্রমহ্রাসমান সার্বজনীনতা এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতা। এই নীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক বিজ্ঞানের অবস্থান তার বিষয় সামগ্রির দ্বারা বোঝা সম্ভব। যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যত সরল, তারা তত কম অন্য বিজ্ঞানের উপর নিরভর্শীল। কারণ সরল এবং সাধারণ ঘটনার গবেষণা করে এমন বিজ্ঞান প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে। যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যত জটিলতম হবে, ততই সে অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে। কারণ, সমাজের বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রগতির সাথে সাথে জটিলতা বাড়ে। কোঁতের মতে সর্বাধিক সরল ঘটনা সর্বাধিক সার্বজনীনতা অর্জন করে অর্থাৎ

যাকে প্রত্যেক স্থানে পাওয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে বলা যায়, সবথেকে প্রথমে যে বিজ্ঞান আসে তা সবচেয়ে বেশি সাধারণ বা সার্বজনীন এবং সবচেয়ে কম জটিল এবং সবথেকে কম বিষয়ের সাথে যুক্ত। পরবর্তীকালে যে বিজ্ঞান আসে তা কম সাধারণ বা সার্বজনীন এবং বেশি জটিল। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক বিজ্ঞান তার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সবথেকে বেশি জটিল এবং বিশেষ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চবিন্যাসের সবশেষে থাকে।

কোঁত এই দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসমূহকে একটি স্তরে পর্যায়ভুক্ত করেছেন—

কোঁত পরবর্তীকালে নীতিবিদ্যা (Ethics)কেও ক্রমোচ্চবিন্যাসের সবশেষে যুক্ত করেছেন। কোঁতের মতে, মানুষের প্রথম যে জ্ঞান আসে সেটি হল গণিত।

১) গণিত: এটি সবথেকে সাধারণ বা সার্বজনীন ঘটনার গবেষণার বিজ্ঞান। সমস্ত বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গণিতের ভিত্তিতে যথার্থ পরিমাপ এবং নিয়মের খোঁজ সম্ভব। অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর সবথেকে কম নির্ভরশীল।

২) জ্যোতির্বিদ্যা: মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিজ্ঞান হল জ্যোতির্বিদ্যা। জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি নক্ষত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কোঁত গণিত এর পর জ্যোতির্বিদ্যার স্থান দিয়েছেন। কারণ জ্যোতির্বিদ্যা কেবলমাত্র গণিতের উপরই নির্ভরশীল।

৩) **পদার্থবিদ্যা:** পদার্থবিদ্যার কাজ হল পদার্থ জগত সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করা। পদার্থবিদ্যা মূলত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত, তবে নিয়ন্ত্রিত নয়, কোঁতের মতে, গণিত ও জ্যোতিবিদ্যা থেকে পদার্থবিদ্যা জটিলতর বিজ্ঞান।

৪) **রসায়ন:** রসায়ন বিদ্যার কাজ হল পদার্থ কোন্ সূত্রের সাহায্যে একে অপরের সাথে মিলিত হচ্ছে তা নির্ণয় করা। রসায়নবিদ্যায় পদার্থবিদ্যা ও গণিতের প্রভাব রয়েছে তাই রসায়নবিদ্যার স্থান পদার্থবিদ্যার ঠিক পরেই রেখেছেন কোঁত।

৫) **জীববিজ্ঞান:** কোঁতের মতে, জীববিজ্ঞানের কাজ হল: জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র আবিষ্কার করা। এই বিজ্ঞান গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সকলের ওপরই নির্ভরশীল।

৬) **সমাজতত্ত্ব:** সামাজিক পদার্থবিদ্যা (Social Physics) বা সমাজতত্ত্ব-এর কাজ হল সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করা। সমাজতত্ত্ব তার বিকাশের পথে অন্যান্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তবে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। সমাজতত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়ের পার্থক্য আনে। যেমন—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বস্তুজগত যা সহজে পরিবর্তন হয় না কিন্তু সমাজের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ পরিবর্তনশীল বলেই এ সম্পর্কে বলা মুসকিল। তাই কোঁত সমাজতত্ত্বকে সবচেয়ে জটিল এবং বিশেষ বিজ্ঞান বলেছেন।

এইভাবে কোঁত বিজ্ঞানসমূহের স্তরবিন্যাসের তত্ত্বে স্পষ্টভাবে দেখান যে, বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চবিন্যাস বিজ্ঞানের ক্রমহ্রাসমান সার্বজনীনতা এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতার নিয়মের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান যতবেশি নবীন হবে, তত বেশি জটিল ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হবে। সমাজতত্ত্ব একটি নবীনতম বিশেষ বিজ্ঞান, সুতরাং এটি তার পূর্ববর্তী সকল বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং জটিলতম বিজ্ঞান।

১.৩.৩ প্রত্যক্ষবাদ (Positivism)

কোঁতের সমাজতত্ত্ব আলোচনার মূল পদ্ধতিবিদ্যা হল প্রত্যক্ষবাদ। কোঁতের সমাজ পুনর্গঠনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভাবনার প্রণালীবদ্ধ রূপ হল প্রত্যক্ষবাদ। তিনি প্রত্যক্ষবাদের ধারণার উল্লেখ করেন তাঁর দুটি বই 'Positive Philosophy' এবং 'Positive Polity'তে। প্রথমে তাঁর বইতে প্রত্যক্ষবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা করেছেন।

কোঁত প্রত্যক্ষবাদকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন। তাঁর মতে, সমাজকে বুঝতে হলে বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভিত্তিতে বুঝতে হবে। বৈজ্ঞানিক নিয়মে কল্পনার কোন ভূমিকা নেই বরং ঘটনাসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞান, প্রয়োগ এবং শ্রেণিবিভক্তিকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কোঁতের প্রত্যক্ষবাদের মূলমন্ত্র হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্গীকরণের ভিত্তির উপর ঘটনার ব্যাখ্যা করা এবং তা বোঝা।

কোঁতের প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্বের দুটি প্রস্তবনা আছে যার উপর ভিত্তি করে এই তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে—

১) যাবতীয় অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় চিন্তা ও দর্শনকে প্রত্যাখ্যান এবং যা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা।

২) অপরিবর্তনীয় কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে গোলা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে এবং এই নিয়মগুলি অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে।

কোঁতের প্রত্যক্ষবাদকে আরও সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য প্রত্যক্ষবাদে যে সমস্ত বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয় তার বর্ণনা করা হল—

১) প্রাকৃতিক ঘটনার মতো সামাজিক ঘটনা কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে চলে। তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব ও প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি অর্থাৎ ঘটনার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ ও শ্রেণীকরণের দ্বারা সামাজিক ঘটনার গবেষণা সম্ভব। সমাজতত্ত্বে প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোঁত।

২) কোঁত সামাজিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শ্রেণিবিভাজনের উপর বেশি জোর দেন।

৩) প্রত্যক্ষবাদে মানুষের বুদ্ধির স্তর খুব উন্নত হয় তাই প্রত্যক্ষবাদের যুক্তির উপরে নির্ভরশীলতা দেখা যায়।

৪) প্রত্যক্ষবাদ প্রধানত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত। অজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের সাথে এর কোন সংযোগ নেই। যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না তা প্রত্যক্ষবাদের বিষয় নয়।

৫) প্রত্যক্ষবাদ হল চিন্তার এমন একটি পদ্ধতি যা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য।

৬) এটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, যার উদ্দেশ্য হল সকল সমাজের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির, নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি নিশ্চিত করা।

কোঁত প্রত্যক্ষবাদের তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন—

১) বিজ্ঞানের দর্শন (Philosophy of the Science)

২) বৈজ্ঞানিক ধর্ম ও নীতি (Scientific Religion and Ethics)

৩) প্রত্যক্ষবাদী রাজনীতি (Positivistic Polities)

১.৩.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা (Social Statics and Social Dynamics)

কোঁত সমাজতত্ত্বকে সামাজিক স্থিতিবিদ্যা এবং সামাজিক গতিবিদ্যা—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ফরাসী বিপ্লবোত্তর সমাজে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যে মতামতের বিভাজন ছিল-একদল সমাজের স্থিতির

পক্ষে ছিলেন এবং অন্যদল সামাজিক গতির বা পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। কোঁত এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, সমাজে কিছু বিষয় তুলনামূলকভাবে স্থায়ী আবার কিছু বিষয় তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনশীল। তাঁর মতে, সমাজে স্থিতি এবং গতি অর্থাৎ পরিবর্তন উভয়ই প্রয়োজন। তিনি বলেন, স্থিতি এবং গতি বিষয় দুটি পরস্পর বিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক। কোঁত সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পরিবর্তন উভয়ের উপরই গুরুত্ব দেন।

সামাজিক স্থিতিবিদ্যা: কোঁতের মতে, সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সমাজ এবং এই সমাজের অস্তিত্বের জন্য কিছু পূর্বশর্ত বর্তমান। এই পূর্বশর্তগুলি স্থিতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়। স্থিতিবিদ্যা সমাজ কাঠামোর নিয়ম, শৃঙ্খলা ও স্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্থিতিবিদ্যার মূল কাজ হল সমাজের নিয়ম বা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক স্থিতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিল খুঁজে বার করা এবং সামাজিক স্থিতির অবস্থাগুলো খুঁজে বার করা।

সামাজিক স্থিতির বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে বলা যায়—

ক) সামাজিক স্থিতি বিদ্যমান সমাজের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

খ) নিয়ম বা শৃঙ্খলা তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সমাজের সকল মানুষের অভিন্ন ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ) সাধারণ ঐক্যমত শৃঙ্খলার মূল ভিত্তি।

কোঁতের মতে, সামাজিক স্থিতিবিদ্যার দায়িত্ব হল সমাজের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধতার দৃঢ়তার নিয়ম আছে তা অনুসন্ধান করা। তাঁর 'System of Positive Polity' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কোঁত সামাজিক স্থিতিবিদ্যার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সামাজিক স্থিতিবিদ্যার দুটি ভাগ আছে—

১) মানবপ্রকৃতির গঠন সংক্রান্ত এবং ২) সমাজের কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা

মানবপ্রকৃতির গঠন বলতে বলেছেন যে, মানুষ বুদ্ধিমান, আবেগ দ্বারা পরিচালিত এবং কর্মপরায়ন। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় বর্তমান। মস্তিষ্ক থেকে বুদ্ধির উদ্ভব হওয়ায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মস্তিষ্কের গঠন প্রায় একই তাই মানব সমাজে বৌদ্ধিক ঐক্য ঘটে থাকে। অন্যদিকে হৃদয় গঠিত আবেগ এবং কর্মপরায়ণতা দ্বারা। বিভিন্ন মানুষের আবেগের মধ্যে পরার্থপরমার বোধ বেশি থাকে তাই এই পরার্থপরতা বোধই সমাজকে ধরে রাখতে সাহায্য করে থাকে।

সমাজ-এর কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় কোঁত ধর্মের তত্ত্ব, ভাষার তত্ত্ব, সম্পত্তির তত্ত্ব, পরিবারের তত্ত্ব ও শ্রমবিভাজনের তত্ত্ব প্রনয়ন করেছেন। তাঁর মতে, সমাজে ধর্ম, ভাষা সম্পত্তি, পরিবার এবং শ্রমবিভাজন সব ক্ষেত্রেই স্থিতির ভিত্তি দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক স্থিতিবিদ্যার মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের যে প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য এবং মতের ঐক্যর দিকটি বোঝা যায় তার বৈজ্ঞানিক পাঠ সম্ভব।

সামাজিক গতিবিদ্যা :

সামাজিক গতিবিদ্যা সমাজের উন্নতি এবং প্রগতির পাঠ করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করে সামাজিক গতিবিদ্যা। কোঁত মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন সর্বদা বজায় থাকবে। সামাজিক গতিবিদ্যা মানুষের অতীতের কোন অবস্থা থেকে বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে সেই রূপই বর্ণনা করে না বরং সমাজের ভবিষ্যতের কি রূপ দেখা যাবে তাও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক গতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল বিসৃত শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা যা মানব সভ্যতার একের পর এক পরিবর্তন ঘটায়। সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস হল সামাজিক গতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞানীরা কাজ হল সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের সূত্র নির্দ্ধারণ করা। কোঁতের মতে, সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে মানব প্রকৃতির উন্নয়ন ঘটে। কোঁত সমাজের প্রগতি সম্পর্কে বলেছেন গতিশীলতাই প্রগতি। তাঁর মতে সমাজের প্রতিটি বিষয় যেমন—দৈহিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতি দেখা যায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর এবং পরিবর্তন না হলে বস্তুগত পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ প্রগতির মূল কথা হল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। কোঁতের মতে দুটি কারণে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে— ১) একঘেয়েমীপনা (Boredom) এবং ২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)

কোঁতের মতে, সামাজিক গতিবিদ্যা মানব সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নকে নির্দিষ্ট করে। তাঁর মতে, সাধারণত উন্নয়নের নিয়মগুলিকে সমাজ মেনে চলে। কিন্তু সময়ের পার্থক্যের জন্য উন্নয়নের মাত্রা ভেদ হয়। কোঁতের সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব তাঁর মানসিক বিবর্তনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই তত্ত্ব অনুসারে ত্রিস্তর বিধিকে তাঁর সামাজিক গতিবিদ্যার উদাহরণ বলা যায়।

কোঁত বলেছেন, আসলে স্থিতি এবং গতি তত্ত্বের দুটি দিক মাত্র। এটি সামাজিক নীতি এবং প্রগতির দ্বৈত ধারণাকে প্রকাশ করে। সামাজিক নীতি সামাজিক অস্তিত্বের শর্তগুলি ভারসাম্যতার সঙ্গে প্রকাশ করে এবং সামাজিক প্রগতি উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরে। সামাজিক নীতির ধারণা সমাজের অস্তিত্বকে বোঝায় যা সমাজকে টিকিয়ে রাখে এবং সামাজিক প্রগতি সমাজ আন্দোলনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে। দুটি ক্ষেত্রই সমাজ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। সুসংগঠিত ও সুসংহত সমাজের গড়ে ওঠার জন্য শৃঙ্খলা ও প্রগতি উভয়ই প্রয়োজনীয় এবং সমাজবিজ্ঞানের সেই সূত্রের আবিস্কার করা উচিত যা সমাজে শৃঙ্খলা ও প্রগতি উভয়ই সম্ভব করে তোলে।

১.৪ সারাংশ

সমাজতত্ত্বে অন্যতম পথ প্রদর্শক ও ফরাসী বিপ্লবের মহান সন্তান সাঁ-সিমোঁর উত্তরসূরী, সমাজতত্ত্বের শ্রষ্ঠা অগাস্ত কোঁত সমাজের বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান-ধারণার গঠন শুরু করেন। প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা তিনি

সমাজের বিজ্ঞানসম্মত দিক উপস্থাপিত করেন। সমাজ ও মানবমনের বিবর্তনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ধর্মতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যা এবং প্রত্যক্ষবাদী স্তরে সমাজকে বিভাজিত করে আলোচনা করেছেন। সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার ধারণার মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরস্থ স্থিতিময় অবস্থান এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পরিবর্তনের সময়ে যে গতিময় অবস্থান বর্তমান থাকে তা বর্ণনা করেন এবং সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য বিষয়ের থেকে জটিল ও উৎকর্ষ প্রমাণ করে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানসমূহের রানী বলে আখ্যায়িত করেন।

১.৫ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: (৬)

১) ধর্মতাত্ত্বিক স্তর বলতে কি বোঝেন?

২) শিল্পসমাজ কি?

৩) সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলতে কি বোঝেন?

৪) সামাজিক গতিবিদ্যা কি?

৫) বিধিবদ্ধ সমাজ বলতে কি বোঝেন?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন: (১২)

১) ত্রিস্তর বিধি বলতে কি বোঝেন? কোঁতের সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২) বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চবিন্যাসের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৩) অগাস্ত কোঁতের প্রত্যক্ষবাদের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

গ) টীকা লিখুন : (২০)

১) প্রত্যক্ষবাদ

২) ত্রিস্তর বিধি তত্ত্ব

৩) সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতি

১.৬ উত্তরমালা

ক) ১) মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের প্রথম স্তর — ঈশ্বর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি — তিনটি স্তরে বিভক্ত — নিয়তিবাদ — বহুঈশ্বরবাদ — একেশ্বরবাদ

২) প্রত্যক্ষবাদী স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত — বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ ঘটে — সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়

৩) স্থিতিবিদ্যা সমাজ কাঠামোর নিয়ম, শৃঙ্খলা ও স্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত — সামাজিক স্থিতি বিদ্যমান সমাজের অবস্থানের সাথে যুক্ত — সাধারণ ঐক্যমত শৃঙ্খলার মূল ভিত্তি — দুটি ভাগ — মানবপ্রকৃতির গঠন এবং সমাজের

৪) সমাজের উন্নতি ও প্রগতি পাঠ করে — সমাজের ভবিষ্যতের রূপ বিশ্লেষণ করে — গতিশীলতা প্রগতির রূপ — মানব সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়ন নির্দিষ্ট করে

৫) অধিবিদ্যক স্তরের অন্তর্গত — এই স্তরে সমাজ মূলত আইননির্ভর — আইনবিদ এবং কূটনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা থাকে

খ) ১) ১.৩.১ দেখুন

২) ১.৩.২ দেখুন

৩) ১.৩.৩ দেখুন

গ) ১) ১.৩.৩ দেখুন

২) ১.৩.১ দেখুন

৩) ১.৩.৪ দেখুন

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Abraham, F & Mongan, J 1985. Sociological Thought. Delhi: Macmillan.

২. Anon, Raymond. 1970 Main currents in Sociological Thought. New York: Doubleday

৩. Coser, Lewis A. 1996. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought. Jaipur: Rawat Publications.

৪. দত্তগুপ্ত, বেলা. ২০১২. সমাজবিজ্ঞান: ওগুস্ত কঁৎ থেকে কার্ল মার্ক্স কলেজ স্ট্রীট: প্রগতিশীল প্রকাশক

৫. ঘোষ, শান্তনু. ২০০২. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা. কলকাতা। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স

একক-২ ❑ হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩)

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্ব চর্চা

২.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ

২.৩.২ সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব

২.৩.৩ সমাজের ধরন

২.৩.৪ সামাজিক ডারউইনবাদ

২.৩.৫ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ উত্তরমালা

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য:

এই একক পাঠ করলে যা যা সহজেই জানা যাবে তা হল—

- সমাজতত্ত্বের অন্যতম স্থপতি হার্বার্ট স্পেনসার সম্পর্কে পাঠকদের মনে ধারণা জন্মাবে
- স্পেনসারের সার্বজনীন বিবর্তনের রূপরেখা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী জানা যাবে
- বিবর্তনমূলক স্তরের ভিত্তিতে রচিত সমাজের বিভাজন সম্পর্কে জানা যাবে
- স্পেনসারের সামাজিক ডারউইনবাদ সংক্রান্ত তত্ত্ব বোঝা যাবে
- সমাজের সাথে জীবদেহের সাদৃশ্য সংক্রান্ত স্পেনসারের মতামত জানা যাবে

২.২ প্রস্তাবনা:

সমাজবিজ্ঞান-এর চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেনসারের নাম অন্যতম। তিনি একাধারে সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং বিবর্তনবাদী ছিলেন। সমাজতত্ত্বের জনক কোঁত মানবমন ও

মানবসমাজের বিবর্তনের যে তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন, স্পেনসার ও তেমনি সমাজের বিবর্তনের এবং সমাজের বিভাজনের রূপ তুলে ধরেছিলেন। বিবর্তনতত্ত্বের ভূমিকা হিসাবে স্পেনসার প্রাণীদেহ ও সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যর কথা বলেছিলেন। মানবসমাজের বিবর্তনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ডারউইন-এর সাথে স্পেনসারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর তত্ত্ব সামাজিক ডারউইনবাদ নামে পরিচিত। বর্তমান এককে স্পেনসারের ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল। তিনি সমাজ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব, ডারউইনবাদ, সমাজের প্রকারভেদ, জৈবিক সাদৃশ্যবাদের তত্ত্বগুলি এই এককে আলোচনা করা হল যার মধ্যে দিয়ে সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস স্পেনসার করেছিলেন তা বোঝা সম্ভব হবে।

২.৩ হার্বার্ট স্পেনসার-এর সমাজতত্ত্ব চর্চা

সমাজতত্ত্ব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বের একজন অন্যতম সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে হার্বার্ট স্পেনসারের নাম চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সমাজতত্ত্বের প্রধান স্থপতি ফরাসী চিন্তানায়ক অগাস্ত কোঁত-এর পরবর্তীতে যার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন হার্বার্ট স্পেনসার। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজতাত্ত্বিক এবং বিবর্তনবাদী দার্শনিক। তাঁকে ইংরেজ সমাজতত্ত্বের জনক (English Father of Sociology) বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

১৮২০ সালে ইংল্যাণ্ডের ডার্বি শহরে স্পেনসারের জন্ম হয়। শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার জন্য স্পেনসারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বাড়িতে বসেই মূলত তাঁর বাবার কাছে শিক্ষা নিতেন। তিনি বিশেষত গণিতে খুবই দক্ষ ছিলেন। যন্ত্রকৌশলেও তাঁর ভাল পড়াশুনো ছিল। তিনি ১৭ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে রেলওয়ে ও ব্রিজ বিভাগে যোগ দেন এবং ৪ বছর কাজ করেন। মূলত ১৮৪১ সালে নতুন একটি রেলওয়ে স্থাপনের সময় কিছু ফসিলের সন্ধান মেলে, যা থেকে স্পেনসার ভূতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ক্রমান্বয়ে জীবাশ্মবিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে মানব জাতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর সমস্ত লেখার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিবর্তমূলক প্রকল্প যা চার্লস ডারউইন তার 'Origin of Species' গ্রন্থে প্রমাণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি অগাস্ত কোঁত, এ্যাডাম স্মিথ, হিউম, কান্ট, মিল, কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন অবস্থায় মারা যান।

২.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ (Organic Analogy)

হার্বার্ট স্পেনসার হলেন জৈবিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তিনি সমাজকে জৈব বিবর্তনের আঙ্গিকে

বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের দুটি শাখা—পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান—এই দুই ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র গ্রহণ করে সমাজ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করেন এবং সমাজের ক্রমবিকাশমান সত্ত্বা প্রমাণ করেন এবং সমাজবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের বিষয়টি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন।

স্পেনসারের মতে, সমাজের ক্রমবিবর্তন সর্বত্রই দেখা যায়। অতি জৈবিক (Super Organic) এর মধ্যেও বিবর্তন প্রক্রিয়া আছে বলে মনে করেন। তিনি অতিজৈবিক শব্দটি এতবার ব্যবহার করেছেন যে, অনেকে তাঁর সমাজবিজ্ঞানকে অতিজৈবিক বিজ্ঞান বলেছেন।

সমাজকে জীব হিসেবে গ্রহণ করতে স্পেনসার কখনো কখনো দ্বিধাবোধ করেছেন কারণ সমাজকে জীব হিসেবে গণ্য করার অর্থ হল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বত্ত্বা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে ধুলিসাৎ করে সমাজের সার্বিক একতার উপর জোর দেওয়া। স্ব-বিরোধিতায় আক্রান্ত স্পেনসার বহুক্ষেত্রে বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয় বরং এটি জীবদেহের অনুরূপমাত্র, এই কারণে স্পেনসার তত্ত্বকে "জৈববাদ" না বলে "জৈবিক সাদৃশ্যবাদ" বলাই অধিক সমিচিন হবে। সমাজ এবং জীবদেহের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে স্পেনসার সেটাই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু সাদৃশ্যের নিয়ম বলতে গিয়ে যেসব বিষয় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নেই সেগুলি উল্লেখ করেছেন।

স্পেনসার সমাজের সাথে জীবদেহের সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য কঠোর প্রয়াস করেছেন। তাঁর মতে, জীবদেহ সম্পর্কে যা প্রাসঙ্গিক, সমাজ সম্বন্ধেও তা সমভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বোঝাই হল বিবর্তনতত্ত্ব গড়ে তোলার প্রথম ধাপ। স্পেনসার তাঁর 'The Principle of Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, সমাজ এতটাই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিশরীরের মতো সংগঠিত যে এদের মধ্যে সাদৃশ্যের থেকে বেশি কিছু লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে স্পেনসার মনে করতেন যে, জীবদেহের যেমন বিকাশ, পরিণতি ও ক্ষয়—এই সব বিভিন্ন স্তর দেখা যায়, সমাজও তেমনি বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে বিকশিত হয় এবং এক নির্দিষ্ট স্তর অবধি বিকশিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্পেনসারের মতে, জীবদেহ এবং সমাজ উভয়ই পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয় এবং এই ক্রমবিকাশকালীন অবস্থায় সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করে। যেমন— বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে জীবদেহ ছিল এককোষী এবং সহজসরল দৈহিক গঠনযুক্ত তেমনি সভ্যতার আদি পর্যায়ে মানবগোষ্ঠী ছোট ছোট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে সরল জীবনযাপন করত। বিবর্তনের পথ বেয়ে যখন প্রাণীকুলের জৈবিক এবং দৈহিক আকৃতি এবং কার্যক্রমের জটিলতা বাড়ে তখন মানবসমাজে ও জটিলতা এবং বিভাজন দেখা যায়। বিবর্তনের যে পর্যায় ক্রমে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত প্রজাতির প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে সেই একই পর্যায়ক্রমে আদিম সমাজ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক শিল্প সমাজে পরিণত হয়েছে। স্পেনসারের মতে, প্রাণীকুলের যেমন আয়তন বাড়ে, সমাজের তেমনি কাঠামো বাড়ে, একটি নিম্নশ্রেণীর জীবের মতো একটি উচ্চশ্রেণীর জীবের ভ্রূণের ও পার্থক্যযোগ্য অংশটি থাকে না, কিন্তু যতই এটি আয়তনে বাড়ে

ততই এর অংশাদির বৃদ্ধি ঘটে এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সমাজের ক্ষেত্রেও এইরকমই হয়। প্রথমদিকে এর বিভিন্ন একক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্নতা সংখ্যাগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে কম থাকে, কিন্তু যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিভাজন ও উপবিভাজনের সংখ্যা বাড়ে এবং আরো নিশ্চিত হয়ে ওঠে। স্পেনসারের মতে, সমাজে একটি পরিকাঠামো বা গঠন আছে যা শারীরিক গঠন এবং পরিকাঠামোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে। তাঁর মতে সমাজ এবং মানুষের দেহ এর মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে। তাঁর 'Study of Sociology' এবং 'Principle of Sociology' গ্রন্থে এই সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের দিকটি নির্দেশ করেছেন। সাদৃশ্যের দিকগুলি হল—

ক) সমাজ এবং জীবদেহ দুটি আকৃতিতে বাড়ে ফলত এদের পরিকাঠামোগত পরিবর্তন হয়। ক্রমশ তারা আকৃতিতে বাড়ে ফলে এদের পরিকাঠামোগত পরিবর্তন হয়।

খ) পরিকাঠামোগত বিভাজন থেকে কার্যগত বিভাজন আসে। প্রত্যেকটি বিভাজিত পরিকাঠামো একাধিক কাজ করে থাকে। এই কাজের উদ্দেশ্য হল সমগ্র ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা।

গ) বিভাজিত পরিকাঠামো এবং কাজ সম্পাদিত হওয়ার জন্য এদের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রয়োজন।

ঘ) প্রত্যেকটি বিভাজিত পরিকাঠামো সমাজ দেহ এবং জীবদেহের একটি সুসংহত ব্যবস্থা বিভিন্ন কোষের সমন্বয়ে একটা জীবদেহ গঠিত হয়। একাধিক মানবগোষ্ঠী তৈরী করে একটি সমাজ। সমগ্র সমাজব্যবস্থা এর অন্তর্গত ক্ষুদ্রাংশের প্রভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

ঙ) জীবদেহ এবং সমাজ-এর পরিকাঠামো কিছু সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং পরবর্তী সময়ে এগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

চ) জীবদেহ এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বিবর্তন পরিবর্তনের জন্য দায়ী, প্রাণী জন্ম হলে স্বাভাবিকভাবেই আকার, আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেমনি সমাজে এই বিবর্তন হতে থাকে যার ফলে সমাজের কাঠামো ও কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

বৈসাদৃশ্যের দিকগুলোও স্পেনসার আলোচনা করেছেন—

ক) সমাজ এবং জীবদেহ দুটিই বহু ক্ষুদ্রাংশের দ্বারা গঠিত, কিন্তু সমন্বয়ের মাত্রা দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের। জীবদেহের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়ে থাকে কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশগুলি একে অপরের থেকে দূরে থাকে।

খ) সমাজ এবং জীবদেহের মধ্যে আরেকটা পার্থক্য হল সমাজ প্রতীকের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, এই রকম নির্ভরতা জীবদেহে তুলনামূলকভাবে কম।

গ) অন্য পার্থক্যটি সচেতনতাকে কেন্দ্র করে আসে। সমাজের প্রতিটি একক সচেতন, লক্ষ্যমুখী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। সেখানে জীবদেহে কেবলমাত্র মস্তিষ্ক সচেতন বিষয় হিসেবে দেখা যায়।

ঘ) সমাজ অন্য সমাজ থেকে কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সক্ষম কিন্তু জীবদেহ অন্য কোন জীবদেহ থেকে কোন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়।

ঙ) স্থান, কাল ও জাতিভেদে একই বর্গের সকল জীবদেহে একই উপাদান বিদ্যমান, কিন্তু স্থান, কাল ও জাতিভেদে বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিরাজ করে।

চ) জীবদেহে পরিবর্তন বা বিকাশের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু সমাজে বিবর্তনের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না।

স্পেনসার যেভাবে সমাজ এবং জীবদেহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তিতে তাকে ক্রিয়াবাদের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে ধরা হয়। অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক কোঁত এবং দুমাইম যেভাবে সমাজ এবং জীবদেহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সমষ্টিগত প্রভাব ব্যক্তিবিশেষকে অবদমিত করেছে। কিন্তু স্পেনসার যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতন হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের অন্যতম ধারক।

এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে শুধু কতগুলো জৈবিক অঙ্গের সমষ্টির মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হতে পারে না, বরং জীবের সৃষ্টির পিছনে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ব্যবস্থাদি ক্রিয়াশীল থাকে। অন্যদিকে, সমাজ গঠনের জন্য কেবল কতগুলি মানুষ থাকলেই হয় না, সমাজকে অনুধাবন করতে হলে ক্ষুদ্র নয় বরং বৃহৎ দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন। আর এভাবে সমাজকে দেখতে হলে সহায়তা নিতে হবে "সিস্টেম"-এর যা কতগুলি পরস্পর নির্ভরশীল ও কতগুলি বহুমুখী বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি সামগ্রিক রূপ। জৈবিক সাদৃশ্যবাদ তত্ত্বের আলোচনায় স্পেনসার এই সিস্টেমের আলোকেই জীবদেহ এবং সমাজের বিশ্লেষণের কথা বলেন।

তাঁর মতে, সমাজকে একটি জীবন্ত সত্তা রূপে বিবেচনা করতে হবে এবং সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ তথা প্রতিষ্ঠানগুলি চিহ্নিত করে তাদের কার্যাবলী ও আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে তিনি সমাজের বিভিন্ন অংশকে ব্যাপক অর্থে তিনটি বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে আলোচনার কথা বলেছেন। এই তিনটি ব্যবস্থা হল— ১) নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (Regulating System) ২) বন্টনমূলক ব্যবস্থা (Distribution System) এবং ৩) টেকসইমূলক ব্যবস্থা (Sustaining System) যা জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মপদ্ধতি, যেমন—নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (মস্তিষ্ক); বন্টনমূলক ব্যবস্থা (হৃদপিণ্ড) এবং টেকসইমূলক ব্যবস্থা (হরমোন, পৌস্টিকনালী) সাথে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ও জীবদেহ উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি স্বাধীন ও স্বনির্ভর নয়। জীবদেহের প্রাত্যহিক ক্রিয়ার জন্য এবং সমাজ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে টিকে থাকার জন্য প্রতিটি অঙ্গ এবং প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জরুরী। স্পেনসার তাঁর জৈবিক সাদৃশ্যবাদ তত্ত্বে এই নির্ভরশীলতার

দিকটিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, যা মূলত কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.২ সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Social Evolution)

জৈবিক সাদৃশ্যবাদকে স্পেনসার তাঁর বিবর্তনবাদের মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হার্বার্ট স্পেনসার সমাজ পরিবর্তনের সূত্রকে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব বলা হয়। বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনসার বলেছেন যে, সৌরজগৎ, জীবজগৎ এবং সমাজজীবনে এক অপরিহার্য পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখা যায়, যার ফলে তিনটি ক্ষেত্রেই অনির্দিষ্ট, সরল ও একমুখী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট, জটিল ও বহুমুখী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অবস্থার উত্তরণ ঘটে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে থাকে বিভাজন ও ঐক্যের প্রক্রিয়া।

স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তন তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে তাঁর ঘটনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে জানা জরুরি। তাঁর এই নিয়মগুলি হল মৌলিক ধারণা যা সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। তিনি সার্বজনীন বিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনটি চিরন্তন সত্য এবং চারটি গৌণ বক্তব্যের অবতারণা করেন। এই তিনটি মৌলিক সূত্র বা চিরন্তন সত্য হল—

১) বস্তুর অবিনস্বরতার সূত্র (Law of indestruetability of matter)

২) গতির ধারাবাহিকতার সূত্র (Law of continuity of motion)

৩) শক্তির স্থায়িত্বের সূত্র (Law of pesistence of force)

অন্যদিকে স্পেনসারের মতে, চিরন্তন সত্য বা মৌলিক সূত্রগুলি থেকে যে চারটি গৌণ উক্তির উদ্ভব ঘটে সেগুলো হল—

১) শক্তিসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান (Persistence of relations among forces)

২) শক্তির রূপান্তর ঘটে মাত্র বিলুপ্তি ঘটে না (Forces are never lost but are transformed into equivalents)

৩) বস্তুর গতি প্রতিবন্ধকতার পথ পরিহারে সক্রিয় থাকে (Everything moves along the line of least resistance.)

৪) বস্তুর মাঝে অদৃশ্য দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে, যা শৃঙ্খলা বজায় রাখে (Rhythm of motion on Alternate Motion)

স্পেনসার দর্শন দুটি স্তরকে স্বীকার করে—

ক) জ্ঞানের অগম্য (The Unknowlable)

খ) জ্ঞানের অধিগম্য (The Knowable)

প্রথমটি ধর্মের এলাকাভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের জ্ঞান।

জ্ঞানের অধিগম্য জগৎ বস্তুসমূহের সমষ্টি দিয়ে তৈরী। এই সমষ্টিবদ্ধ বস্তু সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য স্পেনসার পদার্থ ও গতির নিরন্তর পুনবিবর্তনের সূত্র গড়ে তোলেন। এই সূত্র অনুসারে প্রতিটি বস্তুর ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। যখন সমষ্টিবদ্ধ বস্তুর বাইরের কিছুর প্রভাবে পরিবর্তন হওয়ার পরিমাণ খুব কম হয় বা একেবারেই হয় না তখন এই বিবর্তন প্রক্রিয়া সরল। কিন্তু যখন বস্তুর কেন্দ্রীভূতিকরণ এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে তার প্রগতির হার ও দিশার পরিবর্তন ঘটে তখন এই বিবর্তন প্রক্রিয়া হল যৌগিক। স্পেনসার মূলত সমষ্টিবদ্ধ বস্তুর অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা থেকে স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থার দিকে চলার সঠিক প্রবণতার কথা বলেন যার দ্বারা সমজাতীয়ের অস্থায়ীত্বের সূত্র গড়ে তোলেন। এই সূত্র অনুযায়ী বলা হয়, সমজাতীয় মূলত প্রকৃতিগতভাবে অস্থায়ী যার পরিবর্তন অবসম্ভাবী।

স্পেনসারের বিবর্তনতত্ত্বের মূলে যে দুটি বিষয় প্রধান তা হল—

১) সমাজের শুরু দিকে অল্প সংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতি বর্তমান ছিল কিন্তু কালক্রমে এদের মধ্যে বিভাজন এবং বিভিন্নতার মাধ্যমে পরবর্তীকালে অধিকতর সংখ্যার রূপ বা গঠনাকৃতি সৃষ্টি হয়।

২) সমাজের শুরুর দিকের সরল রূপ বা গঠনাকৃতি পরবর্তীকালে জটিল আকার নেয়।

বিবর্তনের এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী আদিতে বস্তু; জীব ও সমাজ ছিল সরল ও অযৌগিক কিন্তু পরবর্তীকালে তা জটিল ও যৌগিক প্রকৃতির হয়ে ওঠে।

২.৩.৩ সমাজের ধরন (Typology of Society)

স্পেনসার সমাজের বিবর্তনবাদী ধরনের কথা বলেছেন। স্পেনসারের মতে, সামাজিক বিবর্তন এবং জৈব বিবর্তন একই ধারা বর্তমান। সমাজের কাঠামো বা অংশগুলি আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। স্পেনসার তাঁর Principles of Sociology নামক গ্রন্থে সামাজিক বিবর্তনবাদকে দুটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। **প্রথম পর্যায়ে**, সরল সমাজ বিভিন্ন স্তরের যৌগিক সমাজ বা জটিল সমাজে উন্নয়ন ঘটে এবং **দ্বিতীয় পর্যায়ে**, সমরভিত্তিক সমাজ ও শিল্পভিত্তিক সমাজের কথা বলেছেন।

বিবর্তনের ধারায় এবং সামাজিক কাঠামো ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি স্তর আগের স্তরের থেকে বেশি পরিমাণ জটিলতা দেখা যায়। বিবর্তনমূলক স্তরের ভিত্তিতে স্পেনসার চার ধরনের সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই চার ধরনের সমাজ হল—

১) সরল সমাজ (Simple Society) : বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম স্তর হল সরল সমাজ। এই সমাজটি ক্ষুদ্রায়তন ছিল। কতগুলি যাযাবর পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল। অর্থনীতির ভিত্তি ছিল শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ।

২) **যৌগিক সমাজ (Compound Society) :** বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী সরল সমাজের পরবর্তী সমাজ হল যৌগিক সমাজ। কতগুলি সরল সমাজ সমষ্টিভূত হয় অর্থাৎ বহু সংখ্যক পরিবার পরবর্তীকালে কিছু গোষ্ঠী (Elan)এ ভাগ হয়ে যায়। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই যৌগিক সমাজ।

৩) **দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ (Doubly Compound Society) :** বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং অনেক গোষ্ঠী গঠিত হল। এই গোষ্ঠীগুলি উপজাতি (Tribe) সমাজে বিভক্ত হল। কতগুলি যৌগিক সমাজের সমাহারে গঠিত সমাজকে দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ বলে।

৪) **ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ (Triply Compound Society) :** কতগুলি দ্বিগুণ যৌগিক সমাজের সমাহারে ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ গঠিত হয়। এই পর্যায়ে উপজাতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতিরাষ্ট্র (Nation State) তৈরী হয়।

এই সামাজিক বিবর্তনের পদ্ধতিতে দেখা যায় যে সামাজিক কাঠামোগুলির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন অংশ তথা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ঘটে এবং কার্যগত বিশেষিকরণও দেখা যায়। সামাজিক সংগঠন প্রথমে অস্পষ্ট ছিল কিন্তু অস্থায়ী বসবাস থেকে মানুষ যত স্থায়ী বসবাসের দিকে এগোয় ততই সামাজিক সংগঠনে স্পষ্টতা দেখা যায়। প্রথমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মিশ্রিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলি স্বতন্ত্র হয় এবং তাদের কাঠামো ও কার্যাবলী আরো স্পষ্ট হয়। সমাজব্যবস্থার আয়তন বৃদ্ধি পায়, বহুরূপতা দেখা যায় এবং নির্দিষ্টতার দিকে সমাজে বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রগতি ঘটে। এই সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বে পরবর্তীকালে সামাজিক কাঠামো ও ক্রিয়াবাদের ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

স্পেনসারের সমাজ বিভাজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, সমাজের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ রীতিনীতি যেমন—সমাজের আকৃতি, স্থায়ীত্ব, জটিলতা, নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের মাত্রার উপর নির্ভর করে সমাজকে **যুদ্ধভিত্তিক সমাজ** ও **শিল্প সমাজ**— এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এক্ষেত্রে বিবর্তনের মৌলিক সূত্র সরল থেকে জটিল এর প্রয়োগ করেছেন।

৩) **যুদ্ধভিত্তিক সমাজ (Military Society) :** বিবর্তনের প্রথম স্তরে যুদ্ধভিত্তিক সমাজের প্রাধান্য ছিল। প্রথমদিকে যুদ্ধ কেবল প্রকৃতির বিরুদ্ধে হলেও পরবর্তী সময়ে তা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের রূপ নেয়। খাদ্য ও আবাসস্থলের দখলদারির জন্য প্রকৃতির সাথে সাথে অন্য গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সমাজ বিকাশের প্রথম পর্যায়ে সমাজ ছিল যোদ্ধা সমাজ এবং সামরিক দিক থেকে উৎকর্ষ সাধনই ছিল এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। এই সময় শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরতান্ত্রিক। ব্যক্তির সম্পদ সচলতা ও স্বাধীনতার উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল। ব্যক্তির থেকে গোষ্ঠীর সংরক্ষণ মূক্ষ ছিল। সামাজিক মর্যাদা ছিল আরোপিত।

৪) **শিল্প সমাজ (Industrial Society) :** সরল যুদ্ধভিত্তিক সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে ধীরে

ধীরে আকার ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে জটিলতার মুখোমুখি হয় এবং ফল হিসেবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনশীল উপাদানের সহযোগে তা শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের মানুষের নির্ভরশীলতা ছিল মূলত শিল্পকেন্দ্রীক। এই সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ গুরুত্ব পায় এবং মানুষের আইনগত অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃতি পায়। এই সমাজে মানুষ ঐচ্ছিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতার মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করায় অসন্তোষ কম হয় তাই এই সমাজকে শান্তিকামী সমাজ বলা হয়। সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য জনকল্যাণকর কার্যাবলী বৃদ্ধি পায় এবং নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়, শিল্প সমাজে সরকার মূলত বিকেন্দ্রীভূত, স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থা উন্মুক্ত এবং সামাজিক সংগঠনগুলো স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক।

হার্বার্ট স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তন সূত্র একমুখী (Unilinear) ছিল না, ছিল বহুমুখী (multilinear)। বিবর্তন ধারায় ভারসাম্য প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্পেনসারের মতে, বিবর্তনের প্রক্রিয়ার অভিমুখ ভারসাম্যের দিকে। তথাকথিত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে 'বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের' (The struggle for existence) মাধ্যমে।

সারণী :

সরল থেকে জটিল সমাজে বিবর্তন

বৈশিষ্ট্য	যুদ্ধভিত্তিক সমাজ	শিল্প সমাজ
ক্রিয়া	ক্ষমতা সংরক্ষণ ও আক্রমণাত্মক ক্রিয়া	শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক ক্রিয়া
সামাজিক সমন্বয়	সব কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক সহযোগিতা	শুধুমাত্র নেতিবাচক কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও স্বেচ্ছাপ্রবণ সহযোগিতা
ব্যক্তি-রাষ্ট্র সম্পর্ক	ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন	ব্যক্তি স্বাধীনতাযুক্ত
রাষ্ট্রের সংগঠন	কেন্দ্রীভূত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত-আরোপিত	বিকেন্দ্রীভূত, নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত
অর্থনৈতিক ক্রিয়া	স্বনির্ভরতা	মুক্ত বাণিজ্য
সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য	দেশপ্রেম, সাহস, বাধ্যতা, শৃঙ্খলা	স্বাধীনতা মহত্ব, ব্যক্তির আইন প্রণয়নের অধিকার

২.৩.৪ সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) :

সামাজিক ডারউইনবাদ বলতে এমন এক বিশ্বাসকে বোঝানো হয় যাতে মনে করা হয় যে, শুধুমাত্র শক্তিশালী এবং যোগ্যতম ব্যক্তিরাই সমাজে বেঁচে থাকবে এবং উন্নতি লাভ করবে। স্পেনসারের সামাজিক ডারউইনবাদ মূলত দুটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ক) যোগ্যতমের উদবর্তনের নীতি (Principle of the Survival of the Fittest)

খ) প্রতিবন্ধকতা হীনতার নীতি (The principle of Non-interference)

ক) যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের নীতি : ডারউইনের মতো স্পেনসারও মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানব সমাজ থেকে অযোগ্য ব্যক্তিরা অপসারিত হয়ে যায়। এর ফলে মানবগোষ্ঠী আরো বেশি উন্নত অবস্থায় পৌঁছয়। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী অযোগ্যকে অপসারিত করে যোগ্যকে জায়গা করে দেওয়া হয়।

স্পেনসার অবরোহী পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অযোগ্য অক্ষম ব্যক্তিবর্গ প্রাকৃতিক বাছাই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ থেকে অপসারিত করা আবশ্যক। তবে জৈবিক বিচারে জাতির কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, দরিদ্রদের সাহায্য করা রাষ্ট্রের উচিত নয়, তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জনহিতকর কাজকর্মের বিরোধিতা তিনি করেননি। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনের স্বাধীনতা দিতে হবে, তবেই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হবে।

খ) প্রতিবন্ধকতাহীনতার নীতি : হার্বার্ট স্পেনসার মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাবাদী ছিলেন। ব্যক্তির কাজকর্মে রাষ্ট্রের কোনও প্রতিবন্ধকতা বা হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীনে মানুষের সমস্ত কার্যাবলী ও বিষয়াদি পরিচালিত হবে। তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র বাদে অন্য কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া উচিত নয়। স্পেনসার রাষ্ট্রের দুটি কাজের কথা বলেছেন— ক) ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ এবং খ) বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিরাপদ দান

শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা ছাড়া বাকি সকল কাজের দায়িত্ব ব্যক্তির উপর থাকবে। ব্যক্তি তার স্বাধীন উদ্যোগ-এর মাধ্যমে সমস্ত কাজকর্ম করবেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে উন্নত সমাজের সৃষ্টি সম্ভব।

হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর The Proper Sphere of Government নামক প্রবন্ধে অবাধ-নীতির সমর্থন করেছেন। এখানে তিনি ব্যক্তির কাজকর্মের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন।

২.৩.৫ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) :

সমাজতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে মনস্তত্ত্ব চর্চা করা কালীন সময়ে স্পেনসার পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাজের একক এবং সব সামাজিক ঘটনার উৎস হিসেবে দেখেছেন। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও উপযোগীতাবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিশ্বের মৌলিক বিষয় হল ব্যক্তির স্বাধীন সামর্থ্যকে প্রয়োগ করা, যেখানে ব্যক্তির সুখ নিহিত। এই সুখ অর্জনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সমান স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাঁর মতে, সরকারি শাসন যত কম হয়, তত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। স্পেনসার বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জীবন এবং চিন্তাধারার সবক্ষেত্রেই প্রসারিত থাকবে। ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগীতা, রাজনীতিতে কর্তৃত্ব বিরোধ, সবকিছুতেই ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের কার্যাবলী শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারগুলো সংরক্ষিত হয়। এই দিক থেকে বলা যায় যে, স্পেনসার একজন ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রাকৃতিক অধিকার হল মানুষের অধিকার, যে অধিকার তার নিজের সুযোগ সুবিধার সাথে জড়িত, তাঁর মতে, সমাজের উচিত সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা না করা, যদি এটা করা হয় তবে সমগ্র বিশ্ব বোকার রাজত্বে পরিণত হবে। ব্যক্তি যেহেতু সমাজ গড়ে তোলে তাই ব্যক্তির গুণাবলীর উপর সমাজের মান নির্ভর করে। সমাজ এবং রাষ্ট্র যদি জনকল্যাণকর কর্মসূচীর সাহায্যে অযোগ্য, দুর্বল মানুষকে রক্ষা করে তবে সমাজের মানের অবক্ষয় ঘটবে।

২.৪ সারাংশ

স্পেনসার বলেছেন প্রকৃতির মত সমাজের জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞান দরকার এবং তা সম্ভব। কারণ সমাজে যেমন ঐক্যবদ্ধতা আছে তেমনি এর পিছনে এক নিয়মশৃঙ্খলা বর্তমান থাকে। সমাজ যে একটি স্তর অতিক্রম করে ভিন্ন একটি স্তরে রূপান্তরিত হচ্ছে তা নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা বেষ্টিত। তিনি মনে করতেন যে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খল নয় এবং যার বিকাশের সূত্র আছে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা সম্ভব।

স্পেনসারের মতে, জীবদেহের সাথে সমাজের সাদৃশ্য বর্তমান। জীবদেহ এবং সমাজ উভয়ই ক্রমবিকাশ ঘটে এবং ফলস্বরূপ উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করে। তিনি নিম্নস্তরের জীব ও আদিম সমাজ উভয়েরই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সরলতা এবং বিভাজন এবং শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। বিবর্তনের যে পদ্ধতিতে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত মানব প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে আদিম সমাজ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। তিনি অবশ্য জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন। স্পেনসারের জৈবিক সাদৃশ্যবাদ তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায়।

স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করেন। তিনিই আধুনিক বিবর্তনের জন্মদাতা। স্পেনসারের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় চাররকম সমাজের আবির্ভাব ঘটে—সরল সমাজ, যৌগিক সমাজ, দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ ও ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ। কতগুলি উপজাতি নিয়ে দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ এবং জাতিরাষ্ট্র নিয়ে ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ গড়ে ওঠে।

স্পেনসার সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনার মাধ্যমে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সমাজের সংগঠনকে আলোচনা করেন যোগ্যতমের টিকে থাকা এবং টিকে থাকার সংগ্রাম এর ধারণা দ্বারা। এছাড়া স্পেনসারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-এর ধারণা সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনসারের সমাজতাত্ত্বিক অবদানের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়। কোঁত সমাজবিজ্ঞান নামে মানব জ্ঞানের যে শাখার নামকরণ করেছিলেন তা স্পেনসারের হাতে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

২.৫ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: (৬)

১) সরল সমাজ বলতে কি বোঝেন?

২) দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ বলতে কি বোঝেন?

৩) যুদ্ধভিত্তিক সমাজ বলতে কি বোঝেন?

৪) শিল্প সমাজ কি?

৫) সরল সমাজ ও জটিল সমাজের মধ্যে পার্থক্য কি?

৬) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা সম্পর্কে স্পেনসার কি বলেছেন?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন: (১২)

১) হার্বার্ট স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২) সমাজকে স্পেনসার কত ভাগে ভাগ করেছেন? কি কি?

৩) জৈবিক সাদৃশ্যবাদ এর তত্ত্ব আলোচনা করুন।

গ) টীকা লিখুন : (২০)

১) সামাজিক ডারউইনবাদ

২) জৈবিক সাদৃশ্যবাদ

৩) সামাজিক বিবর্তন

২.৬ উত্তরমালা

ক) ১) বিবর্তনমূলক স্তরের ভিত্তিতে সমাজের বিভাজনের প্রথম — যাযাবর পরিবার — শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই স্তর দেখা গেল — উপজাতি সমাজ — অনেকগুলি যৌগিক সমাজের সমাহার

৩) সমাজের আকৃতি, স্থায়ীত্ব, জটিলতা, নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও ধর্মের উপর নির্ভরশীল সমাজের ভাগ — বিবর্তনের প্রথম স্তর — শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরতান্ত্রিক — শাসনব্যবস্থা — মর্যাদা আরোপিত

৪) আক্রমণাত্মক ক্রিয়া — সহযোগিতামূলক ক্রিয়া — বাধ্যতামূলক সহযোগীতা — স্বেচ্ছাপ্রবণ সহযোগীতা — কেন্দ্রীভূত — বিকেন্দ্রীভূত — স্বানির্ভরতা — মুক্তবাণিজ্য

৫) ব্যক্তির স্বাধীন সমর্থন স্বীকৃতি — সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধীতা — প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার থাকা উচিত

খ) ১) ২.৩.১ দেখুন

২) ২.৩.২ দেখুন

৩) ২.৩.৫ দেখুন

গ) ১) ২.৩.৩ দেখুন

২) ২.৩.৫ দেখুন

৩) ২.৩.১ দেখুন

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Abraham, F & Mongan, J 1985. Sociological Thought. Delhi: Macmillan.

২. Anon, Raymond. 1970 Main Currents in Sociological Thought. New Delhi: Doubleday

৩. Coser, Lewis A. 1996. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought. Jaipur: Rawat Publications.

৪. দত্তগুপ্ত, বেলা. ২০১২. সমাজবিজ্ঞান: ওগুস্ত কঁৎ থেকে কার্ল মার্ক্স কলেজ স্ট্রীট: প্রগতিশীল প্রকাশক

৫. ঘোষ, শান্তনু. ২০০২. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা. কলকাতা। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স

একক-৩ ❑ কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩)

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ কার্ল মার্ক্সের সমাজবিজ্ঞান

৩.৩.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

৩.৩.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৩.৩.৩ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব

৩.৩.৪ বিপ্লব

৩.৩.৫ বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব

৩.৩.৬ ভিত্তি ও উপরিকাঠামো

৩.৩.৭ রাষ্ট্র

৩.৩.৮ আমলাতন্ত্র

৩.৩.৯ ধর্ম

৩.৪ সারাংশ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ উত্তরমালা

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য:

এই একক পাঠ করলে যা বোঝা যাবে তা হল—

- সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় কার্ল মার্ক্স এক সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন ধারা প্রবর্তন করেছেন তা জানা যাবে
- সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বোঝা যাবে
- সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম এবং বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যাবে

- সমাজে বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি ও রূপ বোঝা যাবে
- মার্ক্সীয় তত্ত্বে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর রূপ বোঝা যাবে
- উপরিকাঠামো হিসেবে রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র এবং ধর্মের প্রকৃতি ও রূপ বোঝা যাবে

৩.২ প্রস্তাবনা:

কার্ল মার্ক্স ছিলেন এক বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক। তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা সমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করে। সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে কার্ল মার্ক্সের চিন্তা-ভাবনা এক নতুন ধারার সূচনা করে। মার্ক্সের জীবনে দার্শনিক হেগেলের প্রভাব সবচেয়ে বেশি কিন্তু মার্ক্স বিপ্লবী আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ায় হেগেলের দর্শনের ভাববাদী প্রভাব কাটিয়ে উঠতে থাকেন। হেগেলের ভাববাদী ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে মার্ক্স বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মার্ক্স তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সমকালীন দর্শন ও অর্থনীতির প্রেক্ষিতে এক নতুন দর্শন-এর সৃষ্টি করেছিলেন সেই জন্য অনেকে মার্ক্সকে সমাজতাত্ত্বিক বলতে চান না। কিন্তু তিনি নিজে সমাজতাত্ত্বিক না হলেও তাঁর রচনায় 'সমাজবিজ্ঞান' অধ্যায়ন ও গবেষণার অনন্য সম্ভাবনা বর্তমান। বর্তমান এককে মার্ক্সের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যায়ন প্রসঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব, বিপ্লব, বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব, ভিত্তি ও উপরিকাঠামো, রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হল। সমাজচিন্তার ইতিহাসে মার্ক্সবাদ প্রথম একটি পদ্ধতির জন্ম দেয়, যার ভিত্তিতে মানুষের বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনার ও ঐ পদ্ধতিরই সার্থক প্রয়োগ ও বিকাশের মাধ্যমে সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যার বাস্তবভিত্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান এককে কার্ল মার্ক্স ও তার অনুগামীদের রচনা অনুসারে কিছু তাত্ত্বিক ধারণা আলোচনা করা হল।

৩.৩ কার্ল মার্ক্সের সমাজবিজ্ঞান:

কার্ল মার্ক্স সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক নতুন চিন্তা-ভাবনার সূচনা করেন। কোঁত, স্পেনসার, দুর্খাইম, ওয়েবার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের যে ধারা বর্তমান ছিল, কার্ল মার্ক্স-এর সমাজতত্ত্বের চর্চা তার থেকে স্বতন্ত্র। মার্ক্সের সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার মূলে ছিল ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাধারা, মার্ক্সীয় তত্ত্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাজগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং সমাজ পরিবর্তনের দিশা নির্দেশ করেছে।

কার্ল মার্ক্স জার্মানির এক সম্পন্ন পরিবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক্সের জীবনে প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যায়ন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী

লাভ করেন। পরবর্তীকালে ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মার্ক্সের জীবনে দার্শনিক হেগেলের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

পাশ্চাত্য সমাজে মার্ক্সকে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি কিন্তু তাকে অস্বীকার করাও কঠিন ছিল। বলা যায় যে, মার্ক্সীয় চিন্তা ও দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই পূর্বোক্ত পশ্চিমী চিন্তানায়কদের সমাজতত্ত্ব তৈরী হয়েছে।

৩.৩.১ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মার্ক্স 'দ্বান্দ্বিকতা' এবং 'বস্তুবাদ' এই ধারণা দুটিকে পৃথকভাবে ব্যবহার করেছেন। একসঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ধারণাটি মার্ক্স ব্যবহার করেননি। প্রথম প্লেখানর (Plekhanor, 1891) এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধারণা দুটিকে একসাথে ব্যবহার করেন। অবশ্য মার্ক্স "Dialectical Materialism" কথাটি একসাথে ব্যবহার না করলেও তার নানা লেখায় শব্দদুটি পৃথকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হল দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্ববাদ ধারণাটির মাধ্যমে বৈপরীত্যকে বোঝান হয় এবং বস্তুবাদ গঠিত হল বস্তুজগৎকে নিয়ে। মার্ক্স-এর মতে, বস্তুজগতের ঘটনাগুলিকে দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কথা প্রথম বলেন হেগেল, বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব ধারণাটি হেগেলীয় দর্শন থেকে নেওয়া হলেও মার্ক্স এতে নতুন দিক সংযোজন করলেন। এর ফলে দ্বান্দ্বিকতা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল এবং মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নতুন রূপ দান করেন। এক্ষেত্রে মার্ক্স বলেন যে, "আমার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হেগেলীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি থেকে শুধু পৃথকই নয়, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত"। হেগেলের মতে, ভাব (idea) বস্তুকে সৃষ্টি করে। কিন্তু মার্ক্স-এর মতে, বস্তুজগৎ-ই মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়ে 'ভাব'-এর জন্ম দেয়। সুতরাং মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বিচারে 'বস্তু'ই প্রধান, 'ভাব' নয়। এই কারণেই মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা Dialectical Materialism হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ মার্ক্সের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিশ্বজগৎকে অবিরাম গতি, পরিবর্তন, বিকাশ ও লয়—এর প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে। সকল বস্তুর মধ্যেই রয়েছে বৈপরীত্য, অসমঞ্জস্য বা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। সুতরাং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার বিকাশের কারণ হল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। মার্ক্স-এর মতে এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার তিনটি সূত্র আছে। যেমন— ১) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ২) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম এবং ৩) নেতির নেতিকরণ।

১) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন : বস্তুজগতের পরিবর্তন বা বিকাশ সরল পথে চলে না। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ধীর গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তন এক পর্যায় হতে অন্য পর্যায়ে উল্লম্ফনের আকারে প্রকাশিত হয়। অগ্রগতির ধারা

কিছুদূর পর্যন্ত চলে ধীরে ধীরে এবং একটানাভাবে এবং তার পরবর্তী সময়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটে। সহজ থেকে জটিল, নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের বিকাশই বস্তুর প্রকৃতি।

পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরে নিহিত আছে গতিশীলতা। এই গতিশীলতা সর্বদা বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জলের উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে এমন পবর্যায়ে আসে যে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে যায় নির্দিষ্ট সময় পরে আবার জলের উত্তাপ হ্রাস করার ফলে নির্দিষ্ট পর্যায়ে জল বরফে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জলের পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে পরে গুণগত পরিবর্তন ঘটে ফলে জলের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে।

অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জগতে যেকোন বস্তু বা ঘটনার ক্রমবিকাশ ঘটে। তাই দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে ঘটনাকে প্রকাশ করা যায়।

১) ক্রমাগত পরিমাণগত পরিবর্তন

২) পরিমাণগত পরিবর্তনের আকস্মিক ছেদ ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তনের আবির্ভাব

২) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম : দ্বন্দ্ববাদের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরের বিরোধী প্রবণতা বা বৈপরীত্য থাকে। এই পরস্পর বিরোধী প্রবণতার সংঘাত বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। যেমন—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

বৈপরীত্যের মিলন ও সংঘাত গতিশীল বস্তুজগতে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেহেতু বস্তুজগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয় তাই এই গতিশীলতার উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। যেকোন বস্তু বিপরীত গুণ বা বৈশিষ্টর সমন্বয় থাকে তাই বিপরীত এই উপাদানগুলির দ্বন্দ্ব বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে দুটি সিদ্ধান্তের কথা বলা যায়— (১) যেকোন ঘটনা বা বস্তু বিপরীত শক্তির সমন্বয়ে গঠিত, এই সমন্বয় বস্তুটিকে বা ঘটনাটিকে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দিয়ে থাকে। (২) বস্তু বা ঘটনাটির অভ্যন্তরে বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব এই আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে ধ্বংস করে বস্তুটির রূপান্তর ঘটায়। অতএব দ্বান্দ্বিক বিরোধিতাই চূড়ান্ত, বস্তু বা ঘটনার রূপান্তরে এই দ্বন্দ্বই মূল চালিকাশক্তি রূপে কাজ করে। গতিশীল বস্তু জগতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রটির উপস্থিতি দুটি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। **প্রথম** স্তরের দ্বন্দ্বগুলি ধীরে ধীরে উৎসারিত হয়ে বস্তুর পরিবর্তনের পূর্বাভাস সূচিত করে। এই পর্বে বিপরীত শক্তিগুলির সমন্বয় অটুট থাকে কিন্তু ক্রমে এই সমন্বয় হ্রাস পেয়ে বিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে। তখন স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়ায়। বৈপরীত্যের এই দ্বন্দ্ব **দ্বিতীয়** সূত্রের জন্ম দেয়। যখন এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে বস্তু বা ঘটনার মৌলিক রূপান্তর গঠিত হয়। যেকোন সমাজব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিপ্লব এবং বিপ্লবের নিরসন ও নতুন সমাজের জন্ম এইসব এই সূত্রের উদাহরণ।

৩) নেতির নেতিকরণ : দ্বন্দ্ববাদের তৃতীয় সূত্র অনুসারে বিকাশের অপরিহার্য উপাদানগুলি অস্বীকৃতি বা নেতি যার অর্থ হল কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত বস্তু পূর্বেকার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকৃতি জানায় অর্থাৎ পুরাতন থেকে নতুনের জন্ম কিন্তু নতুনের মধ্যে পুরাতনের অস্বীকৃতি দেখা যায়। সমাজ ব্যবস্থাতেও এই ধরনের অস্বীকৃতি দেখা যায়। যেমন—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অস্বীকৃতির অথচ সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকেই ধনতন্ত্রের জন্ম। বস্তুর পরিবর্তনের অর্থ হল প্রথম অবস্থায় নেতিকরণ এবং তার পরিবর্তে নতুন এক বস্তুর উদ্ভব। বস্তুর পূর্বাবস্থার নেতিকরণ ছাড়া তার রূপান্তর ঘটা সম্ভব নয়। এই নেতিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রাক্‌মার্ক্সীয় দার্শনিক চিন্তায় অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ হয়েছিল। প্রথমতঃ অধিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বস্তুর যখন নেতিকরণ তখন সেই নেতিকরণের উৎস নিহিত থাকে বস্তুর বহিঃ জগতে। বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বই বিভিন্ন অবস্থায় নেতিকরণের শর্ত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ অধিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নেতিকরণের অর্থ হল একটি বস্তুর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বে নেতিকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই সঙ্গে বস্তুর স্থিতাবস্থার বিলোপসাধন ও নতুন অবস্থার উদ্ভবের প্রশ্ন বিচার করে তাই অধিবিদ্যার নেতিকরণ থেকে দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা বলা যায়— ১) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর পুরাতন অবস্থার নেতিকরণ ঘটিয়ে নতুন সৃষ্টির পূর্বশর্ত তৈরী করা হয় যা পূর্বের অবস্থার তুলনায় গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চস্তরের। ২) নিছক নেতিকরণের স্বার্থেই বস্তুর একটি অবস্থাকে অস্বীকার করা হয় না। পুরাতন অবস্থায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সবকিছু গ্রহণ ও বর্জন করে তারপর নতুন সৃষ্টির সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা হয়। দ্বান্দ্বিক নেতিকরণ বলতে কোন বস্তু বা ব্যবস্থাকে নিছক অবলুপ্ত করা বোঝায় না নেতিকরণের মাধ্যমে বস্তুর পুরানো রূপ পরিবর্তিত হয়ে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে। নেতির নেতিকরণ যেহেতু একটি অবিরাম প্রক্রিয়া তাই এটিকে ঘূর্ণায়মান রেখার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঘূর্ণায়মান রেখার মত নেতির নেতিকরণের প্রক্রিয়াও ক্রমাগত এক একটি স্তরকে অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। হেগেলের ভাষায় বলা যায়, প্রথম যে ঘটনার নেতি হয় সেটি বাদ (Thesis), যে ঘটনা নেতিকরণ ঘটায় সেটি প্রতিবাদ (Antithesis) এবং নেতির নেতিকরণ সাধিত হয় সম্বাদের (Synthesis) এর মাধ্যমে। তাই দ্বন্দ্বতত্ত্বে সম্বাদ একই সঙ্গে নেতিবাচক ও ইতিবাচক অর্থ বহন করে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব। সমাজের সকল অবস্থাতেই দ্বান্দ্বিকতা বর্তমান থাকে। সমাজের অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি রূপই দ্বন্দ্ববাদ। যেমন—কোন সমাজের দুটি শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ শাসক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই নতুন একটি সমাজের সৃষ্টি হয়। আবার সমাজের বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একটা পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায় যাওয়ার মধ্যেও থাকে দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রতত্ত্বেও একদল মানুষেরা সমাজের উচ্চস্তরে থাকে এবং একদল বঞ্চিত। এদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখা যায়। বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রেও শ্রমিক শ্রেণী ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এদিক থেকে বিচার করলে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিকতা বহাল থাকে।

৩.৩.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

সমাজ বিবর্তনের ধারার সাধারণ নিয়ম বিবৃত করার তাত্ত্বিক প্রয়াসকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্ক্স তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা যখন মানব ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োগ করেন তখন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে পরিণত হয়। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত A Contribution to the critique of Political Economy নামক গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে মানবমনের দার্শনিক ভাবধারা নয়, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের মূল নিহিত থাকে। কারণ উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে ওঠে উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক এর সমন্বয়ে।

মার্ক্সের ভাষায়, "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারায় এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতি চালিকা শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে অভ্যন্তরস্ত বিভাগের মধ্যে এবং এসব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে" (মার্ক্স-এঙ্গেলস, ১৯৭২:৯৮)।

মার্ক্স সমাজ বিবর্তন বোঝার জন্য সমাজের বস্তুগত ধারণার বিশ্লেষণ করার কথা বলেছেন। মার্ক্স বস্তুবাদী অবস্থা বলতে সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে সমাজের পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে উৎপাদন পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত দুটি অংশ—উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। এর নিরবিচ্ছিন্ন ফলস্বরূপ একটি সামাজিক স্তরের আবির্ভাব হয়। মার্ক্স বলেন, যে কোন সামাজিক স্তরের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদনশক্তিগুলি উৎপাদন সম্পর্কের সহায়তা লাভ করে। কিন্তু উৎপাদন শক্তিগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যখন বিদ্যমান সম্পত্তির কাঠামোয় ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কায়েমী স্বার্থগুলোর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় উৎপাদনশক্তির বিকাশ না হয়ে কায়েমী স্বার্থ পরিচালিত উৎপাদনের সম্পর্কগুলো উৎপাদিকা শক্তির নতুনতর বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনশক্তি দ্রুত বিকাশলাভের চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্কগুলো অর্থাৎ প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্ক শ্রমশক্তির গতিকে বাধা দেয়। এইভাবে সমাজের মূল কাঠামোগত দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকলে সমাজের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়, যার ফলে সমাজের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হয় এবং সমাজ নতুন এবং উন্নততর সমাজে পরিণত হয়। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ মানবইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের এই বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়।

মানবসমাজের পরিবর্তনের কারণ হিসেবে মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর কথা বলেছেন। তাঁর

মতে, মানুষের সমাজ আদিম সাম্যবাদ থেকে প্রাচীন দাস সমাজে, দাস সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র আর সর্বশেষ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হবে।

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের একাধিক রচনায় এই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে যে, একটি স্তর থেকে সমাজবিকাশের ধারা যাত্রা শুরু করে তার অব্যবহিত পরের স্তরকে উপেক্ষা করেও সেটি উন্নত পরবর্তী একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। কর্ণফোর্থ বলেছেন, মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সমাজবিকাশের একটি পর্বের অপর একটি পর্ব উত্তরণপ্রক্রিয়াকে তথাকথিত কোন যান্ত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেননি। তিনি একটিমাত্র নিয়মের কথাই বলেছেন, যেটি ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি হল উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধনের ধারণ যার ফলশ্রুতি হল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় সমাজের অগ্রগতি এই সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

মার্ক্স সমাজবিকাশের যে নিয়মের কথা বলেছেন তার তাৎপর্য হল, উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া ইতিহাসকে গতি দেয়, তাকে অর্থবহ করে তোলে। এর অর্থ পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়, পুরোনো ব্যবস্থার মধ্যেই নতুন সমাজের বীজ নিহিত থাকে এবং পুরানো এবং নতুনের দ্বন্দ্বের নিরসন হয় সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে এবং সেই সমাজবিপ্লব চালনা করে যুগের প্রয়োজনে উৎসারিত একটি শ্রেণী। তাই বস্তুবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যায় মানুষের ইতিহাস অর্থবহ যা বাস্তবায়িত হয় সংগ্রামী মানুষের এগিয়ে চলার সাফল্যের মধ্যে মার্ক্স-এঙ্গেলস্ যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব রচনা করেছিলেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সৃজনশীল মানুষ, যে মানুষ তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

৩.৩.৩ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব

শ্রেণী-এর ভাবনাটি মার্ক্সীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং এই শ্রেণীর ভাবনা থেকেই শ্রেণী সংগ্রামের ভাবনার উদ্ভব। মার্ক্স ইতিহাস বিবর্তনের যে ধারা দেখিয়েছেন, তাতে শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। মার্ক্সের মতে, শ্রেণী হল উৎপাদন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একদল মানুষ। যে শ্রেণী উৎপাদন উপাদানের সঙ্গে যত বেশি সম্পর্কযুক্ত সেই শ্রেণী সমাজের তত বেশি উচ্চস্তরে অবস্থান করে। অন্যদিকে উৎপাদন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক যত ক্ষীণ তাদের অবস্থান সমাজের নিম্নস্তরে।

বিভিন্ন সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা যায়। তার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। মার্ক্সের সমাজভেদ অনুসারে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা তাই শ্রেণীর উপস্থিতিও ছিল না। কিন্তু এর পরবর্তীকালীন সময় থেকে প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই দুটি শ্রেণী বিদ্যমান। দাস সমাজ থেকে শুরু করে ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত সমস্ত সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণীর উপস্থিতি দেখা যায়। এক শ্রেণী শোষণ করে এবং অপর

শ্রেণী শোষিত হয়। কোন একটি সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অনুকূলে কাজ করে। এই শ্রেণীটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শোষণ করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মতাদর্শগত অবস্থা গড়ে তোলে। ফলে ঐ শ্রেণীটি বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় না কিন্তু অন্য শ্রেণীটি সমাজের পরিবর্তন চায়। মার্ক্সের মতে, প্রতিটি সমাজে দুটি মূখ্য শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় ফলে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর মতে শ্রেণী সংগ্রাম সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ।

মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বটি বোঝার জন্য তাঁর বর্ণিত সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির ভূমিকা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন—

দাস সমাজ: মার্ক্সের মতানুসারে, দাস সমাজ হল প্রথম শ্রেণীভিত্তিক সমাজ। এই সমাজে দুটি শ্রেণী বিদ্যমান—দাস ও দাস মালিক। উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন ভোগকারী শ্রেণী দাস-মালিক নামে পরিচিত ও উৎপাদনকারী শ্রেণী দাস নামে পরিচিত ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ: দাস সমাজের পরবর্তী সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে একদল মানুষ যাদের হাতে মালিকানা থাকত তারা ছিল সামন্তপ্রভু এবং অন্যদল যাদের ক্ষমতা ছিল না তারা ছিল ভূমিদাস।

পুঁজিবাদী সমাজ: মার্ক্সের মতে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবসানের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটে। পুঁজিবাদী সমাজে দুটি শ্রেণী ছিল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণী।

উপরিউক্ত শ্রেণী ছাড়াও প্রত্যেক সমাজে গৌণ কতগুলি শ্রেণীর উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন—দাস সমাজে দাস ও মালিক প্রভৃতি উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন—দাস সমাজে দাস ও মালিক প্রভৃতি মুখ্য শ্রেণী বাদ দিয়ে কুটীর শিল্পী, কামার প্রভৃতি গৌণ শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস—এই দুটি মুখ্য শ্রেণী বাদে কতগুলি গৌণ শ্রেণী যেমন—বণিক সম্প্রদায়, কারিগর, হস্তশিল্পী প্রভৃতি দেখা যায় এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী বাদে ডাক্তার, উকিল, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত চোর, ডাকাত প্রভৃতি কতগুলি গৌণ শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়।

শ্রেণী সচেতনতা: শ্রেণীর অর্থনৈতিক বা বিষয়গত (Objective) ভিত্তির পাশাপাশি মার্ক্স শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক বা বিষয়ীগত (Subjective) মাত্রার উপরও জোর দেন। মার্ক্স যারা শ্রেণী সচেতন নয় বা অনাত্মাচেতন শ্রেণী (Class in itself) এবং আত্মচেতক (Class for itself) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মার্ক্সের মতে, যতক্ষণ না শ্রেণী তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয় সেই শ্রেণী ততক্ষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে না। মার্ক্সের মতে, শ্রেণী হল অর্থনৈতিক শর্তাদির অন্তর্ভূক্ত গোষ্ঠী এবং মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা (সচেতনতা)—এর সম্মিলিত রূপ। অনাত্মচেতন শ্রেণী থেকে শ্রমিক শ্রেণী ইতিহাসের রূপকার আত্মচেতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা সৃষ্টি হলে তারা উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের বিরোধিতা করে এবং এইভাবে একটি সমাজ ধ্বংস হয় এবং বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ গঠিত হয়।

শ্রেণী → শ্রেণী সচেতনতা → শ্রেণী সংগ্রাম → বিপ্লব → নতুন সমাজ → নতুন শ্রেণী

মার্ক্স তিন ধরনের শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেছেন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম: পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থায় পুঁজির কর্তৃত্ব থাকে মালিক শ্রেণীর উপর এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃত্বহীন থাকে। অথচ, এই শ্রমিকের পরিশ্রমই মালিকের মুনাফার উৎস। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে শোষণ করেই শুরু হয় এর প্রাথমিক বুনিয়াদ। এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাথমিক সংগ্রামও হয় অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজের শর্ত, শ্রমের সময়, বাড়তি মজুরী, কাজের পরিবেশ প্রভৃতি দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণী প্রাথমিকভাবে শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

রাজনৈতিক সংগ্রাম: রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয় যখন শ্রেণী বুঝতে শেখে যে শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামই নয় রাজনৈতিক দখল অর্জন করা না গেলে শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তন হবে না তখন এই সংগ্রাম ঘটে। মার্ক্স রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিটি শ্রেণীসংগ্রাম হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য বলে প্রকৃতগত বিচারে তা বৈষয়িক দাবিদাওয়া আদায় করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম থেকে আলাদা। রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতা ও শ্রেণীসচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সচেতনতা গড়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক ব্যবহার শোষণের বিরুদ্ধে।

মতাদর্শগত সংগ্রাম: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের সাথে মতাদর্শগত পরিবর্তন আনার জন্য এই সংগ্রাম হয়। পুঁজিবাদী সমাজে মালিক শ্রেণী অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখার সাথে সাথে, শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের মতামত সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মালিক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য মানুষকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করে। মার্ক্স এটিকে "ভ্রান্ত চেতনা" সৃষ্টি বলেছেন। নতুন বিপ্লবী মতাদর্শ তৈরী করে পুঁজিবাদী "ভ্রান্ত চেতনা" প্রসারের প্রচেষ্টাকে রোখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয়।

মার্ক্সের মতে, মানবসমাজ হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ সমাজে দুটি মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়। মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অবতীর্ণ সর্বশেষ সমাজটি হল "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র"। তিনি সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা আসবে বা সাম্যবাদী সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ থাকবে না এমন শ্রেণীগত অবস্থানযুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার মতে, সাম্যবাদী সমাজেই সকল শ্রেণীর উন্নতি সম্ভব।

৩.৩.৪ বিপ্লব (Revolution)

মার্ক্সীয় মতবাদ অনুযায়ী বিপ্লব হল একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে সামাজিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে একটি শাসক শ্রেণীর পতন হয় এবং উদ্ভব হয় নতুন এক শাসক শ্রেণীর। উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নতুন শাসক শ্রেণী পুরাতন শাসক শ্রেণী অপেক্ষা বেশি সম্ভাবনাময় ও প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে পরিগণিত। মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে শ্রেণী বিভক্ত যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শ্রেণীর স্বার্থে সমাজব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনই হল বিপ্লব। সমাজব্যবস্থার এই পরিবর্তন (১) মৌলিক বা মূলগত হওয়া চাই। (২) প্রগতিশীল শ্রেণী স্বার্থে হওয়া চাই।

উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন শ্রেণী প্রগতিশীল প্রতিপন্ন হয়। বাস্তবে বিপ্লব হল পুরাতন একটি শ্রেণীর হাত থেকে নতুন একটি শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের ধারক শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করে নতুন প্রগতিশীল শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং নতুন একটি উৎপাদন সম্পর্কের সৃষ্টিকেই বলে বিপ্লব।

বিপ্লবের অর্থ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকে শাসন ক্ষমতার হস্তান্তরকে বিপ্লব বলে ব্যাখ্যা করেন। শাসন ক্ষমতার হস্তান্তর মানে সরকার পরিচালনকারীর পরিবর্তন। এই রকম পরিবর্তনের ফলে সরকারের নেতৃত্ব, চেহারা-চরিত্র-উপকাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে।

সামাজিক বিপ্লব হল সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার রূপান্তর। এ হল সমাজবিকাশের এক গুণগত উল্লম্ফন। এর ফলে পুরানো অর্থে সামাজিক বিন্যাসের অবসান হয় এবং একটি নতুন অর্থে সামাজিক বিন্যাসের আবির্ভাব হয়। একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের রক্ষক শাসক শ্রেণীর পতন ঘটে এবং নতুন একটি শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। নতুন ক্ষমতাসীন শ্রেণীটি এক নতুন উৎপাদন সম্পর্ক কায়েম করার ক্ষেত্রে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মার্ক্সবাদীদের মত অনুসারে, সামাজিক বিপ্লবের মূল ভিত্তি হল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বৈরতা। সামাজিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল আগেকার উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিকাশমান উৎপাদন শক্তির বিরোধের অবসান ঘটানো। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন-উপাদানের মালিকানার পরিবর্তন। সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল এক নতুন রাজনৈতিক ও আইনগত উপরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই উপরিকাঠামো নতুন অর্থে সামাজিক বিন্যাসকে বিকশিত ও দৃঢ় ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবের ফলে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় সমাজের ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতি। সামাজিক বিপ্লব হল সামাজিক প্রগতির এক সুনির্দিষ্ট বিধি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতেই সামাজিক বিপ্লবের পর্যালোচনা

করা হয়। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজ, তারপর ক্রমান্বয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, পুঁজিবাদী সমাজে এবং সত্বাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। এদের মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া রাজনৈতিক বিপ্লব অর্থবহ হয়ে ওঠে না, সামাজিক বিপ্লবের ফলেরাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। কিন্তু এই রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের মধ্যে সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্ব হল সামাজিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। এই অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হয় শ্রেণী সংগ্রামের। বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই অবস্থায় পুরানো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয়। মার্ক্সীয় বিপ্লবের তত্ত্ব পীড়িত মানুষের মনে এই আশা জোগায় যে, শ্রেণীশোষণ ও বঞ্চনা চিরস্থায়ী.....

৩.৩.৫ বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব (Theory of Alienation)

বিচ্ছিন্নতা-এর ধারণাটি মার্ক্স মূলত হেগেলের থেকে নিয়েছিলেন। হেগেলীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের ভিত্তি ছিল দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারা। কিন্তু মার্ক্স দার্শনিক বিচ্ছিন্নতাবোধ সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনা করে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। তিনি বলেন বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি মনোস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক বিষয়। পুঁজিবাদী সমাজের বৈষম্য ও শোষণের ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা যায়। পুঁজিবাদ বিকাশের সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে এবং সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণী এই বিচ্ছিন্নতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মার্ক্স বলেন, বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন মনস্তাত্ত্বিক বা ঈশ্বর প্রদত্ত ঘটনা নয়, বরং এটি একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। মূলত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজের সকল প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে (ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থনীতি) বিচ্ছিন্নতাবোধ চিহ্নিত হয়। আবার এই বিচ্ছিন্নতা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

আক্ষরিক অর্থে বিচ্ছিন্নতা হল এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে মানুষের সৃষ্ট শক্তিগুলি দ্বারা মানুষ অবদমিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণী যখন জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না, অথচ সেই সমাজেই সে বসবাস করতে বাধ্য হয় তখন সে নিজেকে সমাজ থেকে গুটিয়ে ফেলে। এভাবেই বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়।

প্যারিস পাণ্ডুলিপি অনুসারে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মার্ক্স বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত নানাবিধ দিক তুলে ধরেছেন। এগুলি হল—ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা, মতাদর্শগত বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা।

ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা: মার্ক্স ধর্মকে বিচ্ছিন্নতার অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। মার্ক্স বলেছেন, আফিনের নেশায় যেমন মানুষ প্রকৃত অবস্থাকে ভুলে থাকতে পারে ধর্মও তেমন বিকল্প এক পৃথিবীর সন্ধান দেয় যেখানে মূল বিষয় অর্থনৈতিক জগৎ থেকে দূরে সরে থাকে। ক্রমশঃ ধর্মের প্রভাবে মানুষ তার বাস্তবজগৎকে ভুলে বিভ্রান্তির পথে চলে যায় তাই ধর্ম সমাজের মূল প্রভাবক অর্থনীতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

মতাদর্শগত বিচ্ছিন্নতা: মার্ক্সের মতে অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য থাকা গোষ্ঠীগুলি স্বার্থ অনুযায়ী মতাদর্শ তৈরী হয়। এরপর এক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হতে পারে। মার্ক্স বলেন প্রতিটি ধারণা ও মতাদর্শকে বাস্তবমুখী হতে হবে।

রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা: বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে স্বতন্ত্র সত্ত্বা অর্জন করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তখন মানুষ এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা নষ্ট করে। মূলত দুভাবে এই বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাছে মানুষ অসহায়। রাষ্ট্র ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। ফলে মার্ক্সের মতে রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের সাহায্যে মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। তাই মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র থাকলে সমাজে বিচ্ছিন্নতাও থাকবে।

অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা: প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে মার্ক্স অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ওপর অধিকতর আলোকপাত করেন। তিনি অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে চার ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেন। এগুলি হল—

(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা: পুঁজিবাদী সমাজে মার্ক্স মনে করেন উৎপাদনকেন্দ্রীক প্রক্রিয়া থেকে স্বাভাবিক কারণে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় মানুষ উৎপাদন কাজে যুক্ত থেকে আনন্দ পায় না। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় তারা নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে না বরং তারা পুঁজিবাদীদের জন্য কাজ করে এই পুঁজিবাদীরা তাদেরকে পরিবর্তে ন্যূনতম মজুরী দিয়ে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কখন কি করা হবে তা নির্ধারণ করে পুঁজিবাদী শ্রেণী। তাই ক্রমশঃ শ্রমিকেরা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) উৎপাদিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতা: শ্রমিক-এর বিচ্ছিন্নতা এমন পর্যায় পৌঁছয় যে শ্রমিকরা নিজ নিজ উৎপাদিত বস্তু থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শ্রমের ফলে যে বস্তু সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা থাকে। ফলে বস্তুটির প্রতি শ্রমিকের কোন আগ্রহ তৈরী করতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক নিজেও পুঁজিপতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে উৎপাদিত বস্তুর উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ক্রমশঃ উৎপাদিত বস্তুটি পণ্যে পরিণত হয়। যত বেশি শ্রমিক উৎপাদন করে তত বেশি উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক সময় উৎপাদিত বস্তুই হয় শ্রমিকের নিয়ন্ত্রক।

(গ) সহকর্মীদের থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা: পুঁজিবাদে শ্রমিকরা তাদের সহকর্মীদের থেকেও

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মার্ক্স বলেছেন মানুষ তার স্বভাব ধর্মানুযায়ী সাধারণত ঐক্যমত হয়ে যেকোন কাজ সম্পাদন করে। তবে এই কর্মগত সহযোগীতা ধনতন্ত্রে ব্যাহত হয়। একরকম বাধ্য হয়েই মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। অনেক সময় সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তির সাথে ও তাদের কাজ করতে দেখা যায়। যদি সহযোগী কর্মীরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও হয়ে থাকেন তাহলেও তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। এমনও হতে পারে পাশের সহকর্মীটির সাথে অনেকদিন কাজ করলেও তার নামটিও জানা হয় না। এই ধরনের সামাজিক অবস্থায় বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রটি খুবই প্রকট। অনেক সময় তীব্র প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়ে থাকে কর্মীরা, তা থেকে দ্বন্দ্ব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সর্বাধিক উৎপাদনশীলতার জন্য সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। ফলে সহকর্মীদের থেকে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(ঘ) নিজেদের থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা: অবশেষে, ধনতন্ত্রে আরেকটি বিচ্ছিন্নতা দেখা যায় সেটি হল শ্রমিকরা নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা মানবিক ক্ষমতা প্রক্রিয়া থেকে সরে যায়। দেখা যায়, মানবিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ কমে আসে, সে পরিণত হয় কর্মযন্ত্রে। সচেতনতা কমে আসার জন্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ কমে আসে। এর ফলে এক শ্রেণীর মানুষ তার মনুষ্যত্ব প্রকাশে বাধার সম্মুখীন হয় তাই বিচ্ছিন্নতা আসে মানুষের নিজের স্বত্ত্বার সঙ্গে।

ধনতন্ত্র মানুষকে একটি কর্মযন্ত্রে পরিণত করে, তার সৃজনী শক্তির কোন বিকাশ সেক্ষেত্রে হয় না। তাই বলা যায়, মানুষ নিুজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না কেবলমাত্র নিজেকে অস্বীকার করতে শেখে। মার্ক্সের মতে, বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতপক্ষে পরিকাঠামোগত প্রভাবে পারস্পরিকতার বিনাশ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই পারস্পরিকতার বিনাশ ঘটে থাকে। সাম্যবাদ পারে এই বিনাশকে কাটিয়ে উঠে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করতে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা মানুষের ক্ষমতার বিকল্প হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

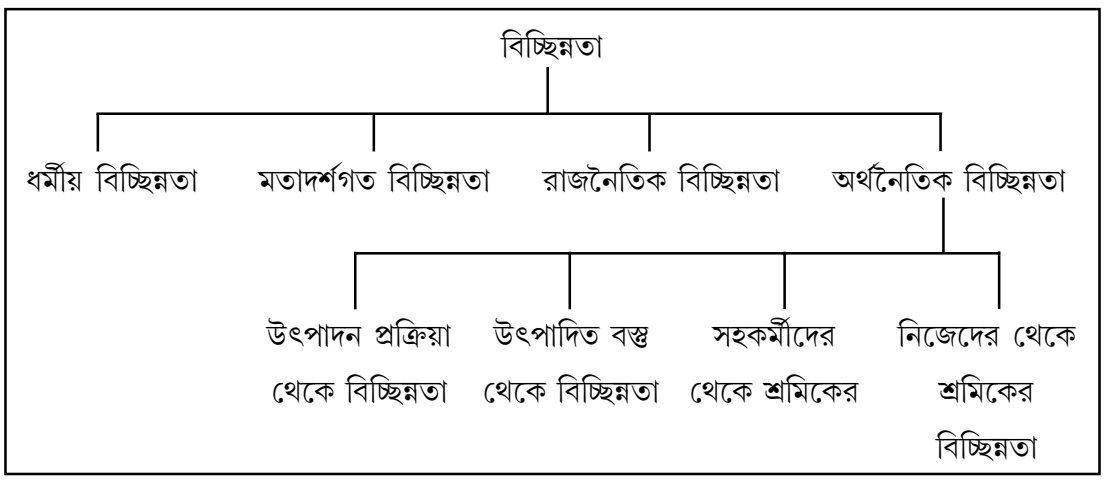

৩.৩.৬ ভিত্তি ও উপরিসৌধ (Base & Superstructure)

মার্ক্স তাঁর ভিত্তি ও উপরিসৌধ-এর তত্ত্বের দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও অন্তর্নিহিত অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাকরণের মধ্যেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ নয়। উৎপাদন-শক্তির অবিরাম গতিশীলতা উৎপাদন সম্পর্কের যে ভিত্তি (Base) প্রস্তুত করে, তার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা, মতাদর্শ, চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণা, মার্ক্সীয় পরিভাষায় এর নাম উপরিসৌধ (Superstructure)। ভিত্তি ও উপরিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম বিষয়বস্তু।

উপরিকাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। প্রথম স্তরে, উৎপাদন-শক্তি, উৎপাদন সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে দেয়, দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদন সম্পর্ক যা সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি, উপরিসৌধের চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো হল মূল ভিত্তি (Base), যেখান থেকে উৎসারিত হয়ে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদান, যেমন—রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক বিভিন্ন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। অতএব, সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ককে সৃষ্টি করে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি, উপরিকাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে সেটি মূল সূত্র।

একটি অট্টালিকা যেমন সুগঠিত ভিত্তি ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না, সমাজজীবনেও অনুরূপভাবে, অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া কোন উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে না। 'ভিত্তি' এবং 'উপরিসৌধ'-এর সমন্বয়েই সমাজদেহ গঠিত। মার্ক্স বলেন বিভিন্ন সমাজে এক একটি নির্দিষ্ট উপরিকাঠামো এবং সেই উপরিকাঠামোগত যাবতীয় আবেগ এবং চিন্তাধারা এক একটি শ্রেণীর বস্তুগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এর সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলোও বিকাশ লাভ করে। মার্ক্স-এর মতে, উৎপাদন-শক্তির সাথে যুক্ত উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সামগ্রিক রূপই সমাজের মূল কাঠামো বা Real Foundation এবং যাবতীয় উপরিকাঠামোগত আইন, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলি মূল কাঠামোর উপর নির্ভর করে গঠিত। এই মূল কাঠামো পরিবর্তন হলে সমগ্র উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন সূচিত হয়।

৩.৩.৭ রাষ্ট্র (State)

মার্ক্সীয় তত্ত্বে রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবৃত নীতি চিন্তা জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ মার্ক্সের আগে চিন্তাবিদরা রাষ্ট্রকে শাশ্বত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। ভাবা হত পৃথিবীতে রাষ্ট্র হল ঈশ্বরের পদক্ষেপ, রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে প্রভৃতি। অন্যদিকে মার্ক্স ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন উপরিকাঠামোর সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র হল শোষণের হাতিয়ার। মার্ক্সের মতে, বৈরগর্ভ সমস্ত সমাজেই রাষ্ট্র হল এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব রক্ষা করার যন্ত্র বিশেষ। রাষ্ট্রের উদ্ভব সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা নয়, বরং সমাজের মুষ্ঠিমেয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য।

এঙ্গেলস্ "The origin of Family, Private Property and States" নামক গ্রন্থে মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শনের মৌলিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী নীতি অনুসরণ করে বলেছেন যে রাষ্ট্র কোন শাশ্বত ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর শুরু থেকে অর্থাৎ মানুষের সমাজ জীবনের গোড়া থেকেই রাষ্ট্র ছিল না। সামাজিক উৎপাদক ব্যবস্থার বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় তখনই রাষ্ট্রগুলির গোড়াপত্তন হয়, বলা বাহুল্য সম্পত্তির মালিকদের নিরাপত্তা দানের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব। সমাজব্যবস্থা যেমন আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এইভাবে কালানুক্রমিক ধারায় বিকশিত হয়েছে, রাষ্ট্রব্যবস্থাও সেইরূপ বিকশিত হয়েছে রাষ্ট্রহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং তারপর থেকে দাস রাষ্ট্র, সামন্ত রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র—এই ক্রম অনুসারে, এঙ্গেলস্ বলেছেন, রাষ্ট্র আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি। অতীতে আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষের রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কারণ জনগণের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাজন ছিল না। উৎপাদিত বস্তু সকলে মিলে ভাগ করে নিত। সমাজ ব্যবস্থার একটি স্তরে এসে একদল হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনের মালিক এবং অন্যদল উৎপাদনকারীর ভূমিকা পালন করতে থাকল। এই শ্রেণী বিভাজনের সময়ই তৈরী হয় রাষ্ট্র। উৎপাদনের মালিকরা সম্পূর্ণ সমাজের উপর আধিপত্ত কায়েম করতে চাইলে তাদের ক্ষমতাশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র হয়ে উঠল এই ক্ষমতাশালী সংগঠন। সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতাশালী শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতাহীন শ্রেণীর শোষণের .....

মার্ক্সের মতে, শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের উপর বজায় থাকে সেই ভূ-সীমার উপর অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয়—

(১) রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ, ধরনের কিছু ব্যক্তির, যাদের হাতে ন্যাস্ত থাকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব। এই সংস্থাটি হল সরকার।

(২) পুলিশ, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র দমনমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে।

(৩) জনগণের কাছ থেকে করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্র টিকে থাকে।

মার্ক্স রাষ্ট্রকে একটি পরগাছা মনে করেন যা সমাজের উপর ভিত্তি করে জীবন ধারণ করে। এবং সমাজের স্বাভাবিক উন্নতিকে ব্যাহত করে। সমাজের অর্থনৈতিক প্রকৃতি সরকারের রূপ নিয়ন্ত্রণ করে।, সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীর স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে।

যেহেতু রাষ্ট্র শাশ্বত নয় তাই মার্ক্সবাদীরা মনে করেন আদিম সাম্যবাদী সমাজের মতো আগামী

দিনেও এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যখন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন আর থাকবে না। যে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের কথা মার্ক্স ভেবেছেন তাতে শোষণযন্ত্ররূপী রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। যদিও রাষ্ট্র উত্তরোত্তর সেভাবে শক্তিশালী হচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎ তার বিলুপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই বলে সমালোচকরা মনে করেন।

৩.৩.৮ আমলাতন্ত্র (Bureaveracy)

মার্ক্সের আলোচনায় আমলাতন্ত্র মূলত তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভাবনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। মার্ক্স আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। আমলাতন্ত্রকে একটি সক্রিয় উপরিকাঠামো বলে মনে করেন। আমলাতন্ত্র সংক্রান্ত মার্ক্সের মতামত প্রধানত "Critique of Hegel's Philosophy of the State" (1843) নামক রচনায় বলা হয়েছে। হেগেল আমলাতন্ত্র বিষয়ক যে ভাববাদী মন্তব্য করেছিলেন, মার্ক্স সেগুলি ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। মার্ক্সের মতে, আমলাতন্ত্রকে "উৎপাদন পদ্ধতি" (Mode of production) এর সাথে যুক্ত করলে এর প্রকৃতি বোঝা যাবে। ওয়েবার যেখানে বলেছেন, আমলাতন্ত্র শিল্প সমাজের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তার একটি প্রতিক্রিয়া সেখানে মার্ক্স বলেছেন, আমলাতন্ত্র শাসক শ্রেণীর আগ্রহকে প্রকাশ করার হাতিয়ার স্বরূপ। মার্ক্সের মতে, আমলাতন্ত্র উৎপাদন শক্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি সমাজে সংখ্যালঘু মানুষ অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর হাতে থাকে। আমলাতন্ত্র ও শাসক শ্রেণীর শোষণের যন্ত্রবিশেষ। আমলাতন্ত্র শাসক শ্রেণীর আগ্রহকেই প্রকাশ করে। অধিকাংশ মার্ক্সবাদী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক সমাজের এক বিশেষ সৃষ্টি বলে মনে করেন।

মার্ক্সের মতে, আমলারা তাদের চাকরিতে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকে। আমলাতন্ত্রে প্রশাসনিক হাতিয়ারগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ব্যবহৃত হয়। মার্ক্সের মতে, আমলাতন্ত্র সর্বজনীন নয় বরং পুরো সমাজের বিশেষ স্বার্থ সঞ্চালিত করে।

রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় বলে এর নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র ভিত্তির মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটা সম্ভব। মার্ক্সীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যায় উৎপাদন মাধ্যমের উপর সাম্যবাদী নিয়ন্ত্রণ বর্তমান হলে তা সম্ভব হবে।

৩.৩.৯ ধর্ম (Religion)

কার্ল মার্ক্স মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উপরিকাঠামো হিসেবে ধর্ম অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে এবং সেই অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, ধর্মবোধের কোনও ব্যবহারিক মূল্য নেই, ধর্মের কোন নিজস্ব ক্রিয়া নেই। ভয় থেকেই ভগবানের ধারণার সৃষ্টি। প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে ভয় ও উদ্বেগ থেকে ধর্মের উদ্ভব। মার্ক্স মানুষকে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিবেচনা করেছেন, ধর্মকে মানুষের সৃষ্টিকর্তা রূপে নয়। মার্ক্সের মতে,

ধর্ম স্বার্থন্বেষী শাসক শ্রেণীর হাতে ন্যাস্ত একটি বিশেষ হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে সমাজের সাধারণ মানুষকে আফিমের নেশার মতো মোহাচ্ছন্ন ও অবশ করে রাখা হয়। সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে ধর্ম ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়। এবং সর্বশক্তিময় ভগবানের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কল্পনা করতে কার্যত তাদের বাধ্য করা হয়। শোষিত মানুষকে ধর্ম নিস্তেজ ও হীনবন করে দেয়। ধর্মকে আশ্রয় করে মানুষ তার বৈপ্লবিক মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবর হওয়ার ক্ষমতা ও উৎসাহ দেখাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী, শ্রেণী শোষণের উদ্দেশ্যেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটলে ধর্ম ও অবলুপ্ত হবে। সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্য বজায় থাকাকালীন সময়ে ধর্মের অবলুপ্তি অসম্ভব। মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদান সমূহের উপর মালিকানা বজায় রাখে এবং সর্বহারা শ্রমজীবী জনগণের উপর শাষণ-শোষণ কায়েম করে এবং অব্যাহত রাখে। সমাজব্যবস্থায় এ ঘটনা যতদিন অব্যাহত থাকবে ধর্মের অস্তিত্ব ও ততদিন অব্যাহত থাকবে। এই কারণে বলা হয় যে, যতদিন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বজায় থাকবে, ততদিন শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী শোষণ, ও ধর্ম সমাজব্যবস্থায় বর্তমান থাকবে। মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকবে না। শ্রমজীবী মানুষ অবস্থায় তারা ধর্মের আধ্যাত্মিক মোহ কাটিয়ে উঠবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুষ্ঠিমেয় পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর সঙ্গে অগণিত শোষিত সর্বহারা জনতার সংগ্রাম চলতে থাকে। এই দীর্ঘকালীন সংগ্রামের পরিণতিতে শোষিত নিপিড়িত শ্রমজীবী জনগণের জয় অনিবার্য। এই অবস্থায় উৎপাদন উপাদান সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক মালিকানা। তখন সমাজে শোষণ থাকবে না। এইভাবে সমাজব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটলে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজজীবন থেকে ধর্ম ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে।

মার্ক্স প্রবর্তিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে দিয়ে মানুষের ধর্মীয় দর্শন পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে তাই মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনধারার কল্পিত কামনা থেকে বর্তমানের বাস্তব জীবনধারার প্রতি তাদের চিন্তাধারাকে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছে। আবার কল্পিত জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে শক্তির প্রতি তারা বিশ্বাসী হয়েছে। তাছাড়া ঐশ্বরিক ধ্যান-ধারণা থেকে তারা ক্রমশঃ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই বলা যায়, মার্ক্স কোনও ভাবেই ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে সংগঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই মার্ক্স বিশ্বাস করতে মানুষ নিশ্চয়ই বাস্তবের উপর ভিত্তি করে পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করবে।

মার্ক্স বলেন, ধর্ম হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি চরমতম উৎপাদন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এর কোন উপযোগীতা নেই। সামাজিক ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে ধর্মের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। তাই তিনি বলেন, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবের উপর ভরসা রেখে মানুষ যদি মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয় তবেই সে সুখী হবে।

৩.৪ সারাংশ

মার্ক্সবাদ একটি বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শন তথা সমাজের সামগ্রিক চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। মার্ক্স মানব সমাজের অর্থনীতি ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ও যুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছিলেন তা সমাজের সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মানবসমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে মার্ক্সবাদ একটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব হিসেবে সুবিদিত। মার্ক্সবাদ হল মানুষের ক্রম অগ্রগতি এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের রূপ। মার্ক্সবাদ হল মানবসমাজ ও জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। মার্ক্সবাদ শুধুমাত্র একটি বিমূর্ত তত্ত্ব হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমূহের ক্ষেত্রে আলোচিত ও যুক্ত হয়নি বরং সেটি সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সূচিত করেছে।

মার্ক্স তার 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' তত্ত্বে জগৎ ও জীবনের গতি প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক রূপ তুলে ধরেছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু এবং মানব সমাজের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুর পিছনে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। এই বিশ্বজগতের কোন কিছুই অজড়, অক্ষয়, অমর নয়। কিন্তু বস্তুর বিনাশের সাথে সাথে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন নয়। বরং বলা যায় ক্রমাগত সৃষ্টি হয়ে চলেছে সৃষ্টি, স্থিতি; প্রলয়ের সূত্র। এই কর্মকাণ্ডের পিছনের সূত্রটি হল প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য। যেমন—জল, একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে বাষ্প হয় আবার নির্দিষ্ট উত্তাপে বরফ হয়। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আবহমানকাল ধরে বস্তুজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। মার্ক্সের মতে, এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার তিনটি সূত্র আছে— (১) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন; (২) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম এবং (৩) নেতির নেতিকরণ দ্বন্দ্ববাদের এই মূল সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব। সমাজের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি রূপই দ্বন্দ্ববাদ।

সামাজিক পরিবর্তনের নিরিখে মার্ক্সবাদ সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছে। এই বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসেবে খ্যাত এবং সেখানে দ্বন্দ্বই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সমাজ ও ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতির প্রয়োগ।

মার্ক্স মূলত জোর দিয়েছেন সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির ধারার মধ্যে এক চালিকাশক্তি বর্তমান যার বিরোধ ও সংগ্রাম পরিবর্তিত অবস্থার বিকাশ ঘটায়। মার্ক্স বর্ণিত আদিম সাম্যবাদী সমাজ সেখানে সম্পত্তির মালিকানা ছিল না, সেই সমাজ বাদে পরবর্তী সকল সমাজ—দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজে দুটি মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ— দাস সমাজের অবসান ঘটে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটে পুঁজিবাদী সমাজ এবং পুঁজিবাদী

সমাজের অবসান ঘটে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শ্রেণীসংগ্রামকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মতাদর্শগত সংগ্রাম।

মার্ক্স তার বিপ্লব সংক্রান্ত তত্ত্বে বিপ্লবকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপরূপে দেখিয়েছেন। বিপ্লব হল একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও সামাজিক ঘটনা। শ্রেণীবিভক্ত যেকোন সমাজে সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর অনুকূলে সমাজব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়াকে বিপ্লব বলা হয়। মার্ক্সবাদে মানবসমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে, বিপ্লবের ফলে সমাজে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিকাশমান উন্নত উৎপাদন শক্তির সংঘাত শেষ হয় এবং মালিকানার পরিবর্তন ঘটে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়।

মার্ক্সের মতে, মানুষের ইতিহাস শুধু শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস নয়, বরং মানুষের বিচ্ছিন্নতার চিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। মার্ক্স সমকালীন সমাজ ও তার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি বলেছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক এবং এই বিচ্ছিন্নতা হয় মূলত উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে, উৎপাদিত বস্তু থেকে, সমকর্মীদের থেকে এবং নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্নতার চারটি প্রকারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং ধর্মীয়।

মার্ক্সবাদে ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর তত্ত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্সীয় দর্শনে সমাজের ভিত হিসেবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছে যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাই হল মূল। এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে সমাজের উপরিকাঠামো গঠিত হয়। সমাজের ভিত্তি হল অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র, ধর্ম, পরিবার, রাজনীতি, সভ্যতা প্রভৃতি উপরিকাঠামো। অতএব সমাজের অর্থনীতির পরিবর্তন হলে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন দেখা যায়।

উপরিকাঠামোর রূপ হিসেবে রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্রকে মার্ক্স শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ধর্মকেও তিনি শোষক শ্রেণী দ্বারা শোষণের একটি হাতিয়ার বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন, ধর্মকে আশ্রয় করে মানুষ তার বৈপ্লবিক মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। শ্রেণী শোষণের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।

৩.৫ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: (৬)

১) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম বলতে কি বোঝায়?

২) নেতির নেতিকরণ কি?

৩) শ্রেণী বলতে কি বোঝায়? শ্রেণী দ্বন্দ্ব কি?

৪) শ্রেণী সচেততা কি?

৫) শ্রেণী সংগ্রামের ধরন আলোচনা করুন।

৬) বিচ্ছিন্নতার ধরন আলোচনা করুন।

৭) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতামত কি?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন: (১২)

১) কার্ল মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২) দ্বান্দ্বিকতা কি? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩) মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৪) মার্ক্সের আলোচনায় বিপ্লবের গুরুত্ব লিখুন।

৫) বিচ্ছিন্নতা বলতে কি বোঝায়? মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিচ্ছিন্নতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬) ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর তত্ত্ব লিখুন।

৭) মার্ক্সের তত্ত্বে রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

গ) টীকা লিখুন : (২০)

১) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

২) শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব

৩) বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব

৩.৬ উত্তরমালা

ক) ১) দ্বন্দ্ববাদের দ্বিতীয় সূত্র—প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরের বিরোধী প্রবণতা থাকে—বৈপরীত্যের মিলন ও সংঘাত গতিশীল বস্তুজগতে পরিবর্তন আনে—বস্তুর অভ্যন্তরে বিপরীত শক্তি থাকে—বস্তু অভ্যন্তরস্ত দ্বন্দ্ব আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে ধ্বংস করে বস্তুর রূপান্তর ঘটায়।

২) দ্বন্দ্ববাদের তৃতীয় সূত্র—কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত বস্তু পূর্বেকার বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বীকৃতি জানায়—নেতিকরণের মাধ্যমে বস্তুর স্থিতাবস্থার বিলোপ ও নতুন অবস্থার উদ্ভব ঘটে বাদ-প্রতিবাদ-সম্বাদ।

৩) শ্রেণী হল উৎপাদন উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একদল মানুষ—প্রতিটি সমাজে দুটি মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়—বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে—সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি শ্রেণীদ্বন্দ্ব।

৪) শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা—শ্রেণীর নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা—অনাত্মচেতক শ্রেণী থেকে আত্মচেতক শ্রেণী

৫) অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম—রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম—মতাদর্শগত সংগ্রাম

৬) ধর্মী বিচ্ছিন্নতা—মতাদর্শগত বিচ্ছিন্নতা—অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

৭) উপরিকাঠামোর সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র—শোষণের হাতিয়ার—মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে।

খ) ১) ৩.৩.২ দেখুন

২) ৩.৩.১ দেখুন

৩) ৩.৩.৩ দেখুন

৪) ৩.৩.৪ দেখুন

৫) ৩.৩.৫ দেখুন

৬) ৩.৩.৬ দেখুন

৭) ৩.৩.৭ দেখুন

গ) ১) ৩.৩.১ দেখুন

২) ৩.৩.২ দেখুন

৩) ৩.৩.৫ দেখুন

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Abraham, F & Mongan, J 1985. Sociological Thought. Delhi: Macmillan.

২. Aron, Raymond. 1970 Main Courrents in Sociological Thought. New York: Doubleday

৩. Coser, Lewis A. 1996. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought. Jaipur: Rawat Publications.

৪. Morrison, Ken. 2006. Marx, Durkheim, Weber—Formations of Modern Social Thought. New Delhi: Sage.

৫. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল. ২০০১. মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৫. দত্তগুপ্ত, বেলা. ২০১২. সমাজবিজ্ঞান: ওগুস্ত কঁৎ থেকে কার্ল মার্কস. কলেজ স্ট্রিট: প্রগতিশীল প্রকাশক

একক-৪ ❑ এমিল দুর্খাইম (১৮৫৮-১৯১৭)

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ দুর্খাইমের সমাজবিজ্ঞান

৪.৩.১ সমাজে শ্রম বিভাজন

৪.৩.২ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির নীতি

৪.৩.৩ আত্মহত্যা

৪.৩.৪ ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক রূপ

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ উত্তরমালা

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য:

এই একক পাঠ করলে যা সহজেই বোঝা যাবে তা হল—

- সমাজতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী চিন্তাবিদ এমিল দুর্খাইম (Emile Durkheim) এর সমাজ বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ধারণা জানা যাবে
- নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব গড়ায় দুর্খাইমের অবদান বুঝতে পারা যাবে
- দুর্খাইমের সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে
- সামাজিক বস্তুসত্যের (Social fact) এর ভিত্তি চিহ্নিত করা যাবে যার দ্বারা সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো যুক্তিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ভাবনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে
- সমাজে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয় বোঝা যাবে এবং সমাজ ও ব্যক্তির অন্তর্ভূক্ত সম্পর্ক বোঝা যাবে
- ধর্মের সামাজিক ভিত্তি বোঝা যাবে

৪.২ প্রস্তাবনা:

সমাজতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমিল দুর্খাইমের অবদান অনবদ্য। অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয় কিন্তু দুর্খাইমকে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। দুর্খাইমের ধ্যান-ধারণা এবং তত্ত্ব-এর পিছনে ইংরেজ চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতাবাদ, হার্বার্ট স্পেনসারের উপযোগিতাবাদ এবং হেগেলের ভাববাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হত। বর্তমান এককে দুর্খাইমের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনা করা হল এবং ফরাসীদেশে সামাজিক পরিবর্তন ও চাহিদা অনুযায়ী সমাজতত্ত্বকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুর্খাইমের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করা হল। এইসব তত্ত্বগুলি হল—সমাজে শ্রমবিভাজন, সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির নীতি, আত্মহত্যা এবং ধর্মের সামাজিক চরিত্র বিষয়ক আলোচনা। দুর্খাইম এই তত্ত্বগুলি আলোচনার জন্য কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেছিলেন। পূর্বসূরীদের মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অবরোহী পদ্ধতি বর্জন করে দুর্খাইম সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা (Social Fact) হিসেবে চিহ্নিত করেন যার দ্বারা সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাতা স্বতন্ত্র সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-এর উপর জোর দিয়েছিলেন এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। এই এককে দুর্খাইম-এর বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হল।

৪.৩ এমিল দুর্খাইমের সমাজবিজ্ঞান

ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক দুর্খাইম সমাজতত্ত্বকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে এর উৎকর্ষতা দান করেন। এমিল দুর্খাইম ১৮৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল, উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের একটি ছোট শহর এপিনালে জন্মগ্রহণ করেন একটি ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল ইহুদী পরিবারে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এপিনাল শহরের 'কাল জ দ্য এপিনাল'-এ তাঁর শিক্ষা শুরু হয় এবং ১৮৯৩ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ভি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী পাঁচ বছর লিসির দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার পর Bordeaux বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯০২ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। সমাজবিজ্ঞানকে তার নিজস্ব নিয়মে ও মানদণ্ডে বিচার্য করার জন্য তিনি উদ্যোগী ছিলেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, দুর্খাইমের তাত্ত্বিক ভিত্তির মূলে ছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯৫ সালের ফ্রান্সের রাজনৈতিক বাতাবরণ। এমিল দুর্খাইম ফরাসী দেশের এক গভীর সঙ্কটকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হয়ে ওঠেন। দেশের এই অবস্থা তাঁর মনে এবং স্বভাবতই, তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে।

ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়াও দুর্খাইমের তত্ত্বের পিছনে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রভাব বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অগাস্ত কোঁত এর প্রত্যক্ষবাদ, সামাজিক বাস্তববাদ (Social realism); ফ্রান্সের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের বাতাবরণ। দুর্খাইমের ধ্যানধারণাও তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে ইংরেজ চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতাবাদ, স্পেনসারের উপযোগিতাবাদ ও হেগেল ভাববাদের এক অভিনব ও চলনসই সামঞ্জস্য দেখা যায়। সমাজতত্ত্বকে নিজস্ব নিয়মে ও মানদণ্ডে বিচার্য করার জন্য দুর্খাইমের উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪.৩.১ সমাজে শ্রম বিভাজন (The Division of Labour in Society)

দুর্খাইমের প্রথম বৃহৎ অভিসন্দর্ভ (dissertation) হল সমাজে শ্রমবিভাজন বা The Division of Labour in Society) স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এত অসংখ্য বিষয় থাকা সত্ত্বেও দুর্খাইম এই বিষয়টি কেন নির্বাচন করলেন? এ সম্বন্ধে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের পর ইওরোপের ফ্রান্সে প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। এই শিল্পবিপ্লব এবং শিল্পসমাজে আস্থা দেশের বহু মানুষের অপছন্দ ছিল। তাঁদের মতে শিল্পবিপ্লব শ্রমবিভাগ জন্ম দেয়। জন্ম দেয় ব্যক্তি স্বাধীনতার, উপযোগবাদ বা Utilarianism এর উপযোগবাদের মাধ্যমে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ফলে সামাজিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে জন্ম নেয় মূল্যবোধহীনতা ফলে ঊনবিংশ শতকে ইওরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে "ব্যক্তিবাদ" শব্দটি ছিল নিন্দনীয়। ব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে এই সময়ের ফরাসী চিন্তাবিদদের ভাবনা ছিল যে, ব্যক্তিবাদই সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী। সুতরাং শিল্পবিপ্লব শিল্পায়ন-এর মাধ্যমে এবং শ্রমবিভাজনসূত্রে নতুন করে ব্যক্তিবাদকে ডাকার প্রয়োজন নেই। অথচ তখনকার দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পায়ন কাম্য ছিল। শিল্পায়নের সূত্রে শ্রমবিভাজন অবশ্য গ্রহণীয়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, শ্রমবিভাজন-এরও একটি সংহতি সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে এবং সংহতি সহায়ক ক্ষমতাটিকে শিল্পসমাজে খুঁজতে হবে, দুর্খাইম তাঁর নিরলস চিন্তা ভাবনায় শিল্পসমাজের এই সংহতির সূত্রটি তুলে ধরলেন।

দুর্খাইমের শ্রমবিভাজন সংক্রান্ত আলোচনার কতগুলি উদ্দেশ্য ছিল—

প্রথমতঃ দুর্খাইম সামাজিক শ্রমবিভাজন এবং অর্থনৈতিক শ্রমবিভাজনের মধ্যে পার্থক্য করা

দ্বিতীয়তঃ সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক এবং সামাজিক যে ভিত্তি ব্যক্তিকে সমাজের সাথে যুক্ত রাখে তা বোঝার চেষ্টা করা

তৃতীয়তঃ সমাজের বিভিন্ন ভিত্তি এবং সংযুক্তি (link) গুলি সমাজের সুসঙ্গতি (cohesion) রক্ষায় কিভাবে সংযুক্ত তা বোঝার চেষ্টা করা এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে সুসঙ্গতি রক্ষিত হয় তা বোঝার চেষ্টা করা

চতুর্থতঃ সামাজিক সংযুক্তির কতটা বিস্তৃতি সমাজকে পরিবর্তন করে তা বোঝার চেষ্টা করা

এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য প্রশ্ন করেন—ব্যক্তি যখন বেশি স্বশাসিত হয়ে ওঠে তখন সমাজের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন কেন? ব্যক্তি কিভাবে একইসাথে বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individual) হয়ে ওঠে এবং সুসঙ্গতিপূর্ণ (Coresive) হয়ে ওঠে?

দুর্খাইমের এই প্রশ্নগুলির উত্তর বোঝার জন্য সামাজিক শ্রমবিভাজন-এর সংজ্ঞা থেকে শুরু করতে হবে— 'শ্রমবিভাজন' শব্দটি সামাজিক তত্ত্বে ব্যবহৃত হয় মূলত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রমের বিভাজিত রূপ বোঝানোর জন্য যাতে যৌথভাবে সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক এবং গৃহস্থালীর কাজগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দ্বারা সম্পাদন করা যায়। সুতরাং বলা যায় ব্যক্তিমানুষ যখন গোষ্ঠী গঠন করতে শুরু করেন তখন থেকেই শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ব্যক্তি বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে না থেকে যৌথভাবে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে শ্রমের বিভাজনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক এবং গৃহস্থালীর কার্যাবলীর সমন্বয় ঘটায়। দুর্খাইম বিশ্বাস করতেন যে শ্রমবিভাজন ব্যক্তির পছন্দের উপর নির্ভরশীল নয় বরং মূলত সমাজের পরিকাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফল।

ভিন্ন ভিন্ন সমাজের শ্রমবিভাজন দেখার সময় দুর্খাইম যা "সামাজিক শ্রমবিভাজন" বলেছেন তা থেকে অ্যাডাম স্মিথের "অর্থনৈতিক শ্রমবিভাজন" এর ধারণার পার্থক্য করেছেন।

দুর্খাইম সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তা বোঝানোর জন্য সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একাত্মতা/সংহতির মাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংহতি বলতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের বিন্যাসকে বোঝায়। সংহতি কখনোই গোষ্ঠী বা সাধারণ স্বার্থ ছাড়া টিকতে পারে না, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের সাথে কিভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ায় আবদ্ধ আছে তার উপর ভিত্তি করেই মূলত সংহতির সৃষ্টি। শ্রমবিভাজনের দিক থেকে দুর্খাইম সামাজিক সংহতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—যান্ত্রিক সংহতি (Mechanical Solidarity) এবং জৈবিক সংহতি (Organic Solidarity), যা দুটি পৃথক সমাজব্যবস্থার আলোকে গড়ে ওঠে।

১) যান্ত্রিক সংহতি (Mechanical Solidarity) : যান্ত্রিক সংহতি হল সাদৃশ্যের সংহতি। সমাজজীবনে যখন অভিন্নতাই প্রধান ও প্রবল এবং বিভিন্নতা প্রায় অনুপস্থিত, সেই অবস্থায় যে সামাজিক সংহতির সৃষ্টি হয় তাকে বলে যান্ত্রিক সংহতি। যান্ত্রিক সংহতি হল সাদৃশ্যমূলক। এ সংহতির নিয়ামক উপাদান হল গোষ্ঠীর ঐক্যমত। অভিন্ন সমষ্টির সদস্য হিসেবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকে। এইরকম সমাজে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পার্থক্য নিতান্তই কম। সমাজের সদস্যদের মধ্যে যৌথ চেতনা বিদ্যমান যা নিজের অধিকারের জন্য একটি ব্যবস্থা গঠন করে।

দুর্খাইমের মতে, এ ধরনের সংহতি আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালের আদিম সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারা, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিন্নতা বর্তমান ছিল।

প্রাচীনকালের বহু উপজাতি অধ্যুষিত আদিম সমাজে এইরকম সংহতি ছিল। এইরকম সমাজকে দুর্খাইম খণ্ডিত সমাজ (Segmental Society) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ সমাজ ছিল প্রাক্ শিল্প যুগীয় সমাজ। এই সমাজের সদস্যদের মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা ছিল অভিন্ন। এই কারণে এখানে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হত। এই সময়কার সমাজ ছিল স্বয়ঃসম্পূর্ণ। রক্তের বন্ধন, পরস্পর নির্ভরতা ও সহানুভূতি এখানে সংহতি রক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করত। আদিম সমাজের মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বসবাস করত। তাদের চিন্তাচেতনা, অনুভূতি, যৌথ চেতনা, সংখ্যা এবং ঘনত্বের দিক থেকে একই ধরনের ছিল।

এ সমাজে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সমস্ত ব্যক্তি সমাজের যৌথ ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করত এবং গোষ্ঠীর যৌথ মনোভাবের বিরোধিতা করতো তাদের শাস্তি পেতে হত। দুর্খাইম আদিম সমাজে প্রচলিত এই আইনব্যবস্থাকে নিপীড়নমূলক আইন (Repressine Law) হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন এটি অনেকখানি অপরাধ আইনের মতই। যান্ত্রিক সংহতির উপর প্রতিষ্ঠিত আদিম সমাজে সমষ্টিগত চেতনাকে আঘাত করত বলে অপরাধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। তখন নিপীড়নমূলক আইন বল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর করে সমষ্টিগত বিবেকের অনুশাসন বলবৎ করা হত। এইভাবে সমাজের প্রতি ব্যক্তিবর্গের অনুগত্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হত।

২) জৈবিক সংহতি (Organic Solidarity):

জৈবিক সংহতি হল বৈসাদৃশ্যের সংহতি। জীবমাত্রই বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। এই অঙ্গগুলির কাজ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই অঙ্গগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্যই জীবদেহের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় আঙ্গিক সংহতির সৃষ্টি হয়। এই সংহতি জৈবিক সংহতি হিসেবে পরিচিত। এই সংহতির মূল সমাজে ব্যক্তির বৈসাদৃশ্যের মধ্যে নিহিত। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্ম দেয়। দুর্খাইমের মতে শ্রমবিভাজনের জন্যই সমাজজীবনে এক ধরনের সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। শ্রমবিভাজনের ফলে সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সমাজজীবনে এই নির্ভরশীলতার সূত্রে সুদৃঢ় হয় সামাজিক সংহতি। এটি আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই সমাজে শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে ব্যক্তির ক্রিয়ার বিভাজন ঘটে। এক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একই সূত্রে গাঁথা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। বিশেষীকরণ এবং ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ হল জৈবিকসংহতির বৈশিষ্ট। সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর জৈবিকসংহতি দানা বাঁধে। এই সমাজে যৌথ বিবেক অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ এই সমাজে শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয় বলে যৌথ বিবেক ততটা প্রয়োজন থাকে না। এই ধরনের উন্নত আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজকে দুর্খাইম পৃথকীকৃত সমাজ (differentiated Society) বলেছেন।

জৈবিক সংহতিতে আইন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির অধিকারকে পুনর্বহাল করা। দুর্খাইম এই ধরনের আইনকে সংশোধনমূলক আইন (Restitutive Law) রূপে অভিহিত করেচেন এবং বলেছেন এটি প্রায় দেওয়ালী আইনের মত। জৈবিক সংহতির উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক উন্নত সমাজের সংশোধনমূলক আইনের উদ্দেশ্য হল সংঘটিত ভুলের সংশোধন। এ ধরনের সমাজে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে ব্যক্তিবর্গ সমাজের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই কারণে সমাজের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সুনিশ্চিত করার জন্য কঠিন-কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এই ধরনের সমাজে সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা হয়।

সংহতি	**সমাজের প্রকারভেদ**
যান্ত্রিক	আদিম সমাজ
বিবর্তন	
জৈবিক	আধুনিক সমাজ

যান্ত্রিক সংহতি ও জৈবিক সংহতির তুলনা

তুলনার ভিত্তি	যান্ত্রিক	জৈবিক
১) কাঠামোগত ভিত্তি	পছন্দের ভিত্তিতে	পার্থক্য ও শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে
	[অনুন্নত সমাজে দেখা যায়]	[উন্নত সমাজে দেখা যায়]
	আদিম গ্রামীণ	নগর-শিল্পভিত্তিক
	খণ্ডিত সমাজ	পৃথকীকৃত সমাজ
	পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা	পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা বেশি
	জনসংখ্যা কম	জনসংখ্যা বেশি
	স্বল্প ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য	উচ্চ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য
২) প্রথার ধরন	নিপীড়নমূলক অনুমতির	সংশোধনমূলক অনুমতির ভিত্তিতে
	ভিত্তিতে নীতি	নীতি
	দণ্ডণীয় আইনের অনুশীলন	সহযোগীতামূলক আইনের অনুশীলন

৩) যৌথ-চেতনার বৈশিষ্ট্য		
ক) প্রকৃতি	উচ্চ মাত্রা	নিম্ন মাত্রা
	উচ্চ ঘনত্ব	নিম্ন ঘনত্ব
	উচ্চ নির্দ্ধারক	নিম্ন নির্দ্ধারক
	সমষ্টিগত	ব্যক্তিকেন্দ্রিক
খ) প্রেক্ষাপট	ধার্মিক (আলোচনার জন্য বন্ধ)	ধর্মনিরপেক্ষ (আলোচনার জন্য মুক্ত)
	মূল্যবোধ সমাজের সাথে যুক্ত	মূল্যবোধ ব্যক্তির সাথে যুক্ত
	জোটবদ্ধ এবং বিশেষ নিয়ম-মাফিক ধরনের উপর চেতনার গুরুত্ব	বিমূর্ত এবং সাধারণ মূল্যবোধের উপর চেতনার গুরুত্ব

শ্রমবিভাজনের কারণ (Causes of Division of Labour)

যান্ত্রিক সংহতি থেকে জৈবিক সংহতিতে উত্তরণের পিছনে কোন্ কোন্ উপাদানগুলি কাজ করে এ প্রসঙ্গে দুর্খাইম কতগুলি সমাজতাত্ত্বিক চলকের কথা উল্লেখ করেন—

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth) : সামাজিক বিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুর্খাইম বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাজে শ্রমের বিশেষীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনে পরিবর্তন আনে, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সামাজিক বিবর্তন এবং শ্রমবিভাজনের মুখ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। দুর্খাইম সমাজবিজ্ঞানের যে শাখাটিকে গঠনবিদ্যা বলে (Morphology) আখ্যা দিয়েছিলেন সেই গঠনবিদ্যার আলোচনায় জনসংখ্যার আকৃতি বা আয়তন একটি প্রধান বিষয়। তিনি জনসংখ্যার পরিমাণ ও ঘনত্ব অনুসারে সমাজে শ্রেণী বিভাগের কথা বলেছেন। তিনি পরিমাণ বলতে সামাজিক এককের (ব্যক্তির) সংখ্যা এবং ঘনত্ব বলতে নির্দিষ্ট সমাজে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের সংখ্যাকে বুঝিয়েছেন। সমাজ জীবনে জনসংখ্যার গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খাইম বলেন, জনসংখ্যার ঘনত্ব দুপ্রকারের, যথা—

ক) বস্তুগত ঘনত্ব (Material Density)

খ) বস্তুগত নৈতিক ঘনত্ব (Moral Density)

বস্তুগত ঘনত্ব জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন, শহরাঞ্চলের বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির উপর

নির্ভরশীল। অন্যদিকে পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগের মধ্যে দিয়ে মানুষের ভেতর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ হল নৈতিক ঘনত্ব। দুর্খাইমের মতে, জনসমষ্টির আয়তন বৃদ্ধি ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই দুই উপাদান মিলিতভাবে সমাজ কাঠামোগত বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। দুর্খাইমের মতে, বস্তুগত ঘনত্ব-র সাথে শ্রমবিভাজনের সম্পর্ক নেই। তবে নৈতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি জৈবিক সংহতিতে উত্তরণের কারণ, এর ফলে মানুষের মধ্যে বেশি বিশেষিকরণ ঘটে, যা জৈবিক সংহতি বিকাশ লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২) নগরসমূহের প্রসার (Expansion of Urban Areas)

শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা পুঞ্জীভবনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতিতে কিভাবে পরিবর্তন দেখা দেয় তার ব্যাখ্যা দুর্খাইম দিয়েছেন। তার মতে, নগর প্রসারের সাথে সাথে ব্যাপকহারে সমাজে শ্রমবিভাজন বেড়ে যায়। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন পেশার মানুষ সেখানে কর্মসংস্থান খুঁজে পায়, তখন ব্যক্তির জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজ বিশেষীকরণ ঘটে, যা জৈবিক সংহতির সৃষ্টি করে।

৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (Development of Communication System)

আধুনিক সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে মানুষ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। সেখানে যে কাজে পারিশ্রমিক বেশি সেখানে জনসমাগম বাড়বে এটা স্বাভাবিক। ফলে শ্রমের বা কর্মের বিশেষীকরণ ঘটে। ফলস্বরূপ সমাজে জৈবিক সংহতি বৃদ্ধি পায়।

৪) **আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (Inter-personal Relation) :** ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এগুলি সমাজে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে। আধুনিক সমাজে পেশার বিশেষিকরণের ফলে এগুলি লক্ষ্য করা যায়। ফলে সমাজে জৈবিক সংহতি গড়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যায় সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সংহতির পরিবর্তন ঘটে।

শ্রমবিভাজনের অস্বাভাবিক রূপ:

দুর্খাইম তাঁর The Division of Labour গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আধুনিক শিল্প সমাজে শ্রমবিভাজন এর অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দুটি প্রধান অস্বাভাবিক রূপের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো: ১) নৈরাজ্যমূলক শ্রমবিভাজন (Anomic Division of Labour) ২) বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাজন (Forced Division of Labour)

১) নৈরাজ্যমূলক শ্রমবিভাজন (Anomic Division of Labour) : দুর্খাইমের মতে নৈরাজ্যমূলক শ্রমবিভাজনটি শ্রমের চরম বিশেষীকরণের ফল। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বিশেষীকৃত কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়ে। এছাড়া বিশেষীকৃত শ্রমবিভাজনের ফলে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে স্থায়ী বিভেদও গড়ে ওঠে। এই অবস্থা থেকে প্রতিকারের উপায় হিসেবে দুর্খাইম পেশাভিত্তিক সংগঠন, আইনের দ্বারা গঠিত সংস্থার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যস্থতার শ্রমিক-মালিক আলোচনা ও আপোষ মীমাংসার সংযোগ এর সৃষ্টি সুপারিশ করেছেন।

২) বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাজন (Forced Division of Labour)

এই ধরনের শ্রমবিভাজন বলতে দুর্খাইম যে অবস্থার কথা বলেছেন তাতে ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ পায় না। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। দুর্খাইমের মতে, ব্যক্তির যোগ্যতা আর এইভাবে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া ভূমিকার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতাই সংঘাতের মূল কারণ।

এছাড়া আর এক ধরনের অস্বাভাবিক রূপের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন সেটি হল শ্রমবিভাজনের ফলে উদ্ভূত কর্মের ত্রুটিপূর্ণ সমন্বয় (Poor Coordination of Functions resulting from the Division of Labour itself)

দুর্খাইম বিশ্বাস করতেন যে, অস্বাভাবিক শ্রমবিভাজন থেকে আধুনিক সমাজ একদিন মুক্ত হবে, তিনি বিশ্বাস করতেন সে ক্ষমতা আধুনিক সমাজে আছে।

২) সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির নীতি (Rules of Sociological Method)

১৮৯৩ সালে 'সমাজে শ্রমবিভাজন' বিষয়ক বইটি প্রকাশিত হবার পর ১৮৯৫ সালে এমিল দুর্খাইম তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখনীয় সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ The Rules of Sociological Method প্রকাশ করেন। সমাজে শ্রমবিভাজন গ্রন্থে দুর্খাইম ফরাসী বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে সামাজিক শ্রমবিভাজনের প্রয়োজন ও উপযোগ সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন। প্রথম গ্রন্থে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজতত্ত্বে "কি বিষয়" পড়ব, আলোচনা করব? দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি মনোনিবেশ করলেন সমাজতত্ত্ব বিষয়টি "কিভাবে", "কি পদ্ধতিতে" পড়ব? এখান থেকেই শুরু হল দুর্খাইমের "পদ্ধতিবিজ্ঞান" বা Methodology সংক্রান্ত আলোচনা। দুর্খাইম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথ পরিহার করে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই বইটি লেখেন যেন প্রথম থেকেই সমাজতাত্ত্বিকেরা স্থিরনিশ্চয় হয়ে ওঠেন যে কিভাবে সমাজতত্ত্ব পড়ব এবং কিভাবে তাকে বিজ্ঞানের অবয়বটি দেওয়া যায়। দুর্খাইমের The Rules of Sociological Method বইটির মূল বক্তব্য ছিল যে সামাজিক ঘটনা যেন কোন ক্রমেই "reductively" অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে যথা দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাখ্যায়িত না হয়। একে সামাজিকভাবে ব্যাখ্যায়িত হতে হবে এবং সামাজিকভাবে ব্যাঘাত হতে হলে বিজ্ঞাননির্ভর পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

সমাজতত্ত্বের পক্ষে স্বাধীন এবং স্বশাসিত এই মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রথম থেকেই প্রয়োজন

সামাজিক বাস্তুসত্য (Social fact) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, সঠিক ধারণা, আমরা সমাজে বাস করি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকি। একক মানুষ সমাজ গঠন করতে পারে না তাকে সংঘবদ্ধ হতে হয় নানা সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ প্রতিষ্ঠানগত স্বীকৃতি পায়। দুর্খাইম এইসব অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানকে "সামাজিক বাস্তুসত্য" (Social fact) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এদের কোনটাই সমাজের মানুষের মনোজগতের বিষয় নয়, তার বহিরঙ্গের বিষয় অর্থাৎ স্পর্শগ্রাহ্য; দৃষ্টিগ্রাহ্য। যাকে স্পর্শ করা যায়, যাকে দেখা যায় এমন কোন "বস্তু"কে বিজ্ঞানের ছকে ফেলে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায়। সুতরাং, সমাজ এবং "সমাজতত্ত্ব"-এর অন্তর্গত বিষয়গুলিকেও আমরা পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারি এবং সেভাবেই আমরা "সামাজিক বাস্তুসত্য" (Social facts)গুলোকে বিচারবিবেচনা করব।

সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা (Social fact)-র ধারণার মধ্যে দুর্খাইম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত বিষয় খুঁজে পান। তিনি মনে করতেন সামাজিক ঘটনাগুলি হল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের (Sui generis) বাস্তবতা, দুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনা অন্য একটি সামাজিক ঘটনার ফল তা কখনই ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের ফল নয়। এমনকি জৈব বা অর্থনৈতিক কারণ ও সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সামাজিক বস্তুসত্যকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। সামাজিক ঘটনাগুলির বিশেষ কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা আছে। এগুলি বহুযুগ ধরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবৎকাল পেরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। দুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলী পদার্থ বা বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের মনে যে বিষয়ীগত (Subjective) ও অস্পষ্ট ধারণা আছে তা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্ব থাকে যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একইভাবে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একইভাবে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট বদলে যায় না। সামাজিক ঘটনাবলীকেও এইরকম বিষয়গত, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, বহির্গত ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য অস্তিত্ব হিসেবে দেখতে হবে। সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা বলতে দুর্খাইম যৌথভাবে কাজ করা, চিন্তা করা ও অনুভব করার পদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন যাদের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত অস্তিত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। সামাজিক বস্তুসত্য-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা দুর্খাইম চিহ্নিত করেছিলেন—

ক) সামাজিক বস্তুসত্য সমাজের মতই স্বয়ংসিদ্ধ বা Sui generis

খ) সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনাগুলি ব্যক্তিচেতনার বহির্ভুত (Exterion) অর্থাৎ ব্যক্তিচেতনার উপর বা ব্যক্তির উপলব্ধির উপর সামাজিক ঘটনার অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

গ) সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনাবলী ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা (Constraint) বিস্তারে সক্ষম। অর্থাৎ সামাজিক ঘটনাবলী ব্যক্তি আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সামাজিক ঘটনাবলীর

দমনমূলক ক্ষমতা আছে যার দ্বারা এরা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরাপক্ষে নিজেদের প্রতিক্ষা করতে পারে। এদের অগ্রাহ্য করে ব্যক্তির পক্ষে তার খুশীমতো কিছু করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শাস্তির ভয়ে আইন ভঙ্গ করে কোন কাজ মানুষ সচরাচর করে না।

ঘ) সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনাবলী অব্যতিক্রমী এবং স্বাধীন (Generality plus independence)

দুর্খাইম সামাজিক ঘটনাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন—

১) স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনা (Normal Social Fact)

২) বিকারগ্রস্ত সামাজিক ঘটনা (Pathological Social Fact)

এছাড়্যা দুর্খাইম সামাজিক ঘটনাকে দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১) বস্তুগত সামাজিক ঘটনা (Material Social Fact)

২) অবস্তুগত সামাজিক ঘটনা (Non-material Social Fact)

বস্তুগত সামাজিক ঘটনাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

ক) সমাজ (Society)

খ) সমাজের কাঠামোগত উপাদানসমূহ (যেমন—গীর্জা ও রাষ্ট্র) (Structural Components of Society, For Example, Church and States)

গ) সমাজের আদি উপাদানসমূহ (যেমন—জনসংখ্যা বন্টন) যোগাযোগের মাধ্যম এবং বাসস্থান ব্যবস্থাপনা (Morphological Componets of Society, for example, Population distribution, Channels of Communication and housingh arrangements)

অবস্তুগত সামাজিক ঘটনাগুলি হল—

ক) নৈতিকতা (Morality)

খ) যৌথ চেতনা (Collective Conscience)

গ) যৌথ উপস্থাপনা (Collective Representations)

ঘ) সামাজিক চিন্তাধারা (Social Currents)

দুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যের সঠিক প্রকাশ ঘটে ব্যক্তির মধ্যে নয়, গোষ্ঠীর মধ্যে। সামাজিক ঘটনাগুলি ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বা ব্যক্তিগত ঘটনা থেকে সামাজিক ঘটনা ভিন্ন, ব্যক্তিমানুষের আবেগ, প্রবৃত্তি ও অভ্যাস দমন করা সম্ভব কারণ এগুলি কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) কিন্তু সামাজিক ঘটনাগুলি কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) হওয়ায় বাইরে থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয় ব্যক্তির উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণের আনতে সক্ষম।

সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনাবলীর বহির্গত অস্তিত্বের (Objective) প্রভাবে সামাজিক অভিজ্ঞতার একটি অভিন্ন চরিত্র গড়ে ওঠে। এর ফলে "যৌথ বিবেক" (Common Conscience) এবং "যৌথ চেতনা" (Common Conscieousness) গড়ে ওঠে। দুর্খাইমের মতে, যৌথ বিবেক হল সাধারণ সদস্যদের সাধারণ বিশ্বাস ও ভাবাবেগের সমষ্টি। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ সমাজের প্রত্যেক সদস্যর মান প্রোথিত হয়ে যায় ফলে সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে তাদের সহমত পোষণ করতে দেখা যায়। এই যৌথ বিবেক বহুকাল ধরে বজায় থাকে এবং এর বিরুদ্ধে কোন কাজ সংঘটিত হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক মূল্যবোধগুলির ক্রমোচ্চ বিন্যাস দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত মূল্যবোধগুলিকে দুর্খাইল যৌথ উপস্থাপনাসমূহ (Collective representations) বলেছেন। সমষ্টিগত বিবেক হলো প্রকৃতিতে বিষয়গত (Objective), বিষয়ীগত (Subjective) নয়। কারণ এর অস্তিত্ব ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। এটি ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় নির্দেশ, দুর্খাইমের মতে, যৌথ বিবেক ও যৌথ চেতনা সামাজিক ঐক্য সাধনে সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায় দুর্খাইম তার সামাজিক বস্তুসত্য-এর ধারণার মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের স্বাধীন ও স্বশাসিত মর্যাদা অর্জন করতে যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

৪.৩.৩ আত্মহত্যা

১৮৯৭ সালে দুর্খাইম তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ "Suicide"-এ আত্মহত্যা নামক সামাজিক ঘটনার সামাজিক কারণ নির্দেশ করেছেন। দুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রদত্ত মনস্তাত্ত্বিক, সৌজাত্যবিদ্যাগত (Evgenies) জীবতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক তত্ত্বগুলি খণ্ডন করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা-হতাশা-বিষাদবোধ। দুর্খাইম দেখান যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাগল বা স্নায়বিক ব্যধিগ্রস্থ লোকের সংখ্যা বেশি হলেও এদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা কম। সুতরাং মানসিক কারণে অত্মহত্যা ঘটে এই যুক্তি খাটে না। সৌজাত্যবিদ আবার আত্মহত্যাকে বংশজাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্খাইম বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে দেখান যে আত্মহত্যার হার বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বেশি। দুর্খাইম প্রশ্ন তোলেন যে আত্মহত্যার হার তো বংশগত হলে বয়স্ক লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি হবে কেন? বংশগত হলে তো কম বয়সেই আত্মহত্যা বেশি হত।

আপাতদৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক আচরণ বলে মনে হলেও দুর্খাইম এটিকে সামাজিক ঘটনা বলে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে, আত্মহত্যা কোন ইচ্ছামাফিক গঠনবিহীন ক্রিয়া নয়, কতগুলি ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কৃতকর্মও নয়। কারণ 'আত্মহত্যা' ঘটনাবলীর পরিসংখ্যান গ্রহণ করা যায়। এর পরিমাণ নিরূপণ করা যায়, ফলে এটি কেবলমাত্র 'আত্মহত্যা' হিসেবেই বিবেচ্য থাকে না, তা সামাজেক ঘটনায় পরিণত হয়।

আত্মহত্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুর্খাইম বলেন, প্রতিটি মৃত্যু, যিনি মারা গেলেন তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পাদিত কাজ। সেটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। এরকম কোন কাজের ফলশ্রুতিতে কেউ মারা গেলে সে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে। যেমন—কোন ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে নিজেকে হত্যা করলে তা আত্মহত্যা হবে। আত্মহত্যার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) মৃত্যু

২) যে ঘটনার ফলে মৃত্যু হবে সেই মৃত্যুর ঘটনার কারণ হবে ব্যক্তি নিজে

৩) সেই কাজটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে

৪) সেই কাজটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে।

আত্মহত্যার ধরন :

দুর্খাইমের মূল বক্তব্য হল সমাজ কাঠামোর মধ্যেই আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ কাঠামো ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে দুর্খাইম তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য অপর এক ধরনের আত্মহত্যার কথাও বলেছেন। সেগুলি হল—

১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide)

২) পরার্থে আত্মহত্যা (Altruistic Suicide)

৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)

৪) অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা (Fatelistic Suicide)

১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা : গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির সাযুজ্যের (integration) অভাবে এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় যখন গোষ্ঠীর মধ্যে ঠিকমতো সংবদ্ধ হতে পারে না, যখন আশেপাশের লোকেদের থেকে মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন এই রকম আত্মহত্যা ঘটে। দুর্খাইম বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং জাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ঐক্যের তারতম্যের বিচার করেছেন এবং সেই ঐক্যের হারের সাথে আত্মহত্যার হারের কমাবাড়ার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি দেখিয়েছেন যেন ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টানদের থেকে অনেক কম। প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাসে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে, অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা দেয়, যৌথ পালনীয় বিশ্বাস সেভাবে গড়ে ওঠে না। ক্যাথলিকদের ধর্মবিশ্বাসে ঠিক এর বিপরীত প্রবণতা দেখা যায়। দুর্খাইমের মতে গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশি ঘটে এবং এর বিপরীত কারণে ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার তুলনামূলকভাবে কম। দুর্খাইম আরও বলেছেন যে, অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ও ছোট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বিবাহিত ও বড় পরিবারের সদস্যদের থেকে

বেশি। দুর্খাইমের মতে, বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনজনিত গুরুদায়িত্ব যত বাড়ে আত্মহত্যার প্রবণতা তত কমে।

২) পরার্থে আত্মহত্যা : ইংরেজী Altruism শব্দের উৎপত্তি ফরাসী ভাষা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক কোঁত তার মতবাদের ব্যাখ্যায় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ঠিক বিপরীত ধরন হল পরার্থে আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যা সংগঠিত হয় সমষ্টির ইচ্ছায়, সমষ্টির স্বার্থে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কর্ণধার সমাজ। অর্থাৎ সমাজে যা অভিপ্রায় তা চরিতার্থ করা ব্যক্তি বিশেষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন বা সামাজিক কর্তব্য পালনে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ব্যক্তি যখন গোষ্ঠী বা সমাজকে চরম ভালোবাসে এবং এর প্রতিদানস্বরূপ নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না তখনই এ ধরনের আত্মহত্যার জন্ম হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যখন কারণটা মহৎ বলে মনে হয় তখন সে আত্মহত্যা করে। পরার্থ আত্মহত্যার উদাহরণ হিসেবে জাপানী হারাকারি প্রথা, হিন্দু সাধরদের ঈশ্বরলাভের জন্য সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রথা এবং সেনাদলের আত্মোৎসর্গকারী বাহিনীর দ্বারা শত্রুর ক্ষতি করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানের কথা বলেছেন।

পরার্থে আত্মহত্যাকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

ক) বাধ্যতামূলক আত্মহত্যা (Obligatory Suicide) : এই ধরনের আত্মহত্যায় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। সমাজের বিধিবিধান অনুসারে তাকে আত্মোৎসর্গ করতে হয়। সতীদাহ প্রথা এ ধরনের আত্মহত্যার উদাহরণ।

খ) ঐচ্ছিক আত্মহত্যা (Optional Suicide) : এই ধরনের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, সে নিজ ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক চাপের জন্য নয় বরং আত্মহত্যা করলে সে প্রশংসিত হবে এবং না করলে নিন্দিত হবে এইজন্য আত্মহত্যা করে। যেমন—কোন দেশের সৈনিকদের দেশের জন্য আত্মহত্যা।

গ) উগ্রপ্রকৃতির আত্মহত্যা (Acute Suicide) : এ ধরনের আত্মহত্যা শুধু আত্মবিনাশ সমাজে নিন্দিত বা পূজ্য হওয়ার জন্য নয়। নির্বাণ লাভের অভিলাষই এ ধরনের আত্মহত্যার মূল কারণ। যেমন— অনেক পুরোহিতরা দেহে অগ্নি সংযোগ করে এ ধরনের আত্মবিনাস সাধন করে থাকেন।

দুর্খাইমের আত্মহত্যার প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় "সামাজিক সাযুজ্য" (Social Integration) এর উপর ভিত্তি করে আত্মহত্যার দুটি বিপরীত ধরন—আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা ও পরার্থে আত্মহত্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুর্খাইমের আত্মহত্যার দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Regulation) এর রকমফেরের উপর নির্ভর করে দুই ধরনে আত্মহত্যা—নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা এবং অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা।

৩) **নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide) :** নৈরাজ্য বলতে বোঝায় সমাজের আদর্শ বা মূল্যবোধহীনতা। অর্থাৎ নৈরাজ্যমূলক অবস্থায় সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন, বিশ্বাস প্রভৃতি ভেঙে পড়ে এবং ব্যক্তির উপর সমাজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়, শিল্পে মন্দার সময়, মূল্যবৃদ্ধির সময় অথবা অর্থনৈতিক অতি সমৃদ্ধির সময় এই রকম আত্মহত্যা দেখা দিতে পারে। যখন বহুসংখ্যক লোকের মাত্রাতিরিক্ত দুর্যোগ দেখা দেয় তখন এমন আত্মহত্যা দেখা দিতে পারে আবার যখন বহুলোকের মাত্রাতিরিক্ত অর্থ লাভ হয় তখনও এমন আত্মহত্যা হতে পারে। এই ধরনের সহসা ঘটা পরিবর্তনের ফলে সামাজিক নীতিবোধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। কারণ পুরোনো নীতিগুলি তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে এবং যুগপোযোগী নতুন নীতিগুলি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মানুষের উচ্চাশা অপরিমিত হয়ে ওঠে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অকার্যকারী হয়ে ওঠে। অথবা মানুষের উচ্চাশা শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফলে সে মনের চাহিদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। ফলে আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দুর্খাইমের মতে, মানুষের জৈব কাঠামো বা মানসিক গড়নের মধ্যে এমন কিছু নেই যা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাশাকে দমন করতে পারে, একমাত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণই তা পারে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণই সেই নৈতিক শক্তি যোগায় যা ব্যক্তির চাহিদাগুলি শাসিত করে, কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভেঙে যায় এবং নৈরাজ্য ঘটে ফলে আত্মহত্যা বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সমাজে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকে তা যদি হ্রাস পায় তবে সমাজে নিয়মহীনতা দেখা যায়। দুর্খাইমের মতে, সমাজে নৈরাজ্য বৃদ্ধির কতগুলি কারণ দেখা যায়—অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিল্পগত সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলে একরকম নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে সমাজে, নৈরাজ্যগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়—

ক) প্রবল অর্থনৈতিক নৈরাজ্য (Acute Economic Anomic)

খ) দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক নৈরাজ্য (Chronic Economic Anomic)

গ) প্রবল গ্রার্হস্থ্য নৈরাজ্য (Acute Domestic Anomic)

ঘ) দীর্ঘস্থায়ী গ্রার্হস্থ্য নৈরাজ্য (Chronic Domestic Anomic)

৪) **অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide) :** দুর্খাইমের আত্মহত্যার সর্বশেষ বিভাগটি হল অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা। সুইসাইড নামক গ্রন্থের পাদটীকায় সংক্ষেপে এই আত্মহত্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এইরকম আত্মহত্যা নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার বিপরীত স্থান অবস্থান করে। দুর্খাইমের মতে, নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা যেখানে নিয়ন্ত্রণহীনতাকে বোঝায় সেখানে অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা ঘটে নিয়ন্ত্রণের আধিক্যের জন্য। এই ধরনের আত্মহত্যার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্রীতদাস (Slave)দের মালিকদের অধীনে কাজ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। উপরোক্ত চার ধরনের আত্মহত্যার বিশ্লেষণের মধ্যে

দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন দুর্খাইম যে আত্মহত্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, নানারকম সামাজিক কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। দুর্খাইম তুলনামূলক পদ্ধতির সাথে তাঁর আত্মহত্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন খুঁজেছেন এবং তাঁর তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। দুর্খাইম বলেছেন, "আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত বিষয় যার কারণগুলি অবশ্যই সামাজিক।"

সারণী : আত্মহত্যার ধরন

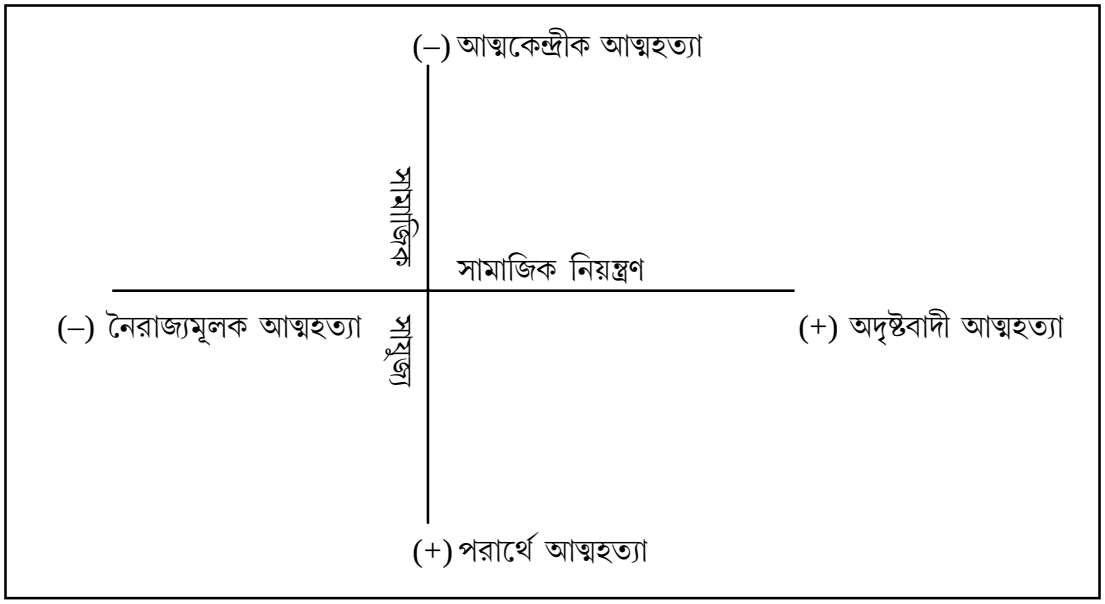

সারণী : আত্মহত্যার ধরনের সাথে সংহতির সম্পর্ক

সাযুজ্য	নিম্ন	আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা
	উচ্চ	পরার্থে আত্মহত্যা
নিয়ন্ত্রণ	নিম্ন	নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা
	উচ্চ	অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা

৪.৩.৪ ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক রূপ (Elementary Forms of Religious Life) :

দুর্খাইমের লেখা সর্বশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The Elementary Forms of Religious Life (1912)— এ দুর্খাইম ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ধর্ম সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দুর্খাইম। দুর্খাইম তার ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় যৌথ উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদির ভূমিকা ও সমাজের সদস্যদের উপর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে। এইভাবে ধর্ম সামাজিক সংহতি রক্ষা করে চলে।

দুর্খাইম তাঁর গ্রন্থের প্রথম অংশ পূর্বসূরী নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের লেখাকে সমালোচনা করে বলেন যে, তাদের দেওয়া ধর্মীয় ব্যাখ্যাসমূহ সমাজতাত্ত্বিক নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক এবং তারা ধর্মকে এক প্রকার মোহ বা ভ্রম রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ধর্মের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কখনই মোহ বা ভ্রম হতে পারে না।

সাধারণ অর্থে অতিপ্রাকৃত সত্তা ও রহস্যাবৃত শক্তিতে বিশ্বাস হল ধর্মের মূল কথা। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ অতিপ্রাকৃত সত্তা ও রহস্যাবৃত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। মানুষের ভয়-ভীতি এর সাথে জড়িত। এছাড়া এরকম সত্তা ও শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পূজা-অর্চনায় প্রবৃত্ত হয়। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন ধর্ম কতগুলি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই উৎপত্তি লাভ করেছে। রবার্টসন স্মিথের অনুসরণে দুর্খাইম মনে করতেন, আধুনিক মানুষের মত আদিম অধিবাসীরাও দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমী, দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার জন্য কতগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়োজিত হত। অনেকদিন যাবৎ ঐসব আচার-অনুষ্ঠান দানা বেঁধে কতগুলি বিশ্বাসের রূপ নেয় এবং এগুলি ধর্ম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি হয়।

দুর্খাইমের মতে, ধর্ম হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি একটি সামাজিক ঘটনা বা বস্তুসত্য যা মানুষের জীবনের অনেকাংশ জুড়ে আছে। ধর্মকে তিনি কখনোই জৈবিক ধারণার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেননি বরং এক সামাজিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ধর্ম হল পবিত্র বস্তু সম্পর্কিত কতগুলো বিশ্বাস ও প্রসার সমষ্টি। যেমন—খ্রিস্ট ধর্মে-র চার্চকে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায় ধর্ম হল কতগুলো বিশ্বাস ও আচরণের পারস্পরিক নির্ভরশীল ব্যবস্থা। দুর্খাইমের মতে, প্রথমে ধর্মের ধারণা পবিত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, পরে এই বিশ্বাসের ধারণা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয় এবং এই বিশ্বাস ও আচার-আচরণ পবিত্র কিছু বিষয় সম্পর্কে হয়। এই বিশ্বাস আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান ও মানুষকে একত্রিত করে একটি নৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করে তাদেরকে, যারা এটি অনুসরণ করে। অর্থাৎ ধর্মের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল:

১) বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যবস্থা;

২) বস্তু পবিত্র, নিষিদ্ধ হবে;

৩) নৈতিকতা দ্বারা আবদ্ধ থাকবে।

দুর্খাইম মনে করতেন যে ধর্মতত্ত্বের মূল উপাদানসমূহ আদিম ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই কারণে তিনি "টোটেমিজম" (Totemism) নামক আদিম ধর্মীয় রূপ নিয়ে চর্চা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম সমাজতত্ত্বের এক প্রাচীনতম গড়নই টোটেমবাদ এবং তা প্রাচীনতম সামাজিক

সংস্থার (ধর্ম) সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি উদাহরণ হিসেবে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অরুনটা (Arunta) উপজাতিদের 'টোটেম' বিশ্বাস, এই প্রাচীনতম উপজাতিদের ধর্মীয় বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ধর্মের আদিমতম অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। আদিম সমাজে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন Clan বা কুলগোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকত। প্রতিটি কুলগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন 'টোটেম'ভুক্ত। অস্ট্রেলিয় আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম প্রথা এক পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। টোটেম হল কুলগোষ্ঠী প্রতীক। বিভিন্ন ধরনের বস্তু যেমন—বৃক্ষ বা পশু-পক্ষী, কাঠের টুকরো, পালিশ করা রত্ন ইত্যাদি টোটেম হিসাবে গৃহীত হয়। এই টোটেমগুলিকে পবিত্র বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয় আবার টোটেম প্রথা কুলগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে সম্পৃক্ত বলে তা অরুণটাদের মধ্যে সমাজবন্ধনের সৃষ্টি করে। দুর্খাইম বলেছেন, টোটেম প্রথা কিছু পশু-পক্ষী, বস্তুর উপাদান নয় বরং এক ধরনের নামহীন ও বিষয়গত শক্তির উপাসনা, যে শক্তি এইসকল সত্তার প্রতেকটিতেই প্রকাশিত হয় কিন্তু যা সমাজের সাথে অভিন্ন নয়। কুলগোষ্ঠীর প্রতীক হিসাবে পবিত্র টোটেমের আরাধনা প্রকৃতপক্ষে সমাজেরই আরাধনা। বিভিন্ন কুলগোষ্ঠী টোটেমকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান হয় তা মূলত সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে।

দুর্খাইমের মতে ধর্ম হল পবিত্র বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের প্রস্পরিক নির্ভরশীল ব্যবস্থা, যা একদল মানুষকে প্রতিষ্ঠানের (যেমন—গীর্জা) মাধ্যমে একটি নৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করে। ধর্ম সামাজিক সংহতি ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সদস্যরা একত্রিত হয় এবং তাদের মাঝে সামাজিক সংহতি দৃঢ় হয়।

দুর্খাইমের মতে, যাবতীয় সামাজিক ঘটনাবলীকে ধর্ম দু-ভাগে বিভক্ত করে। প্রত্যেক সমাজে পবিত্র এবং অপবিত্র বলে দুটি পার্থিব বস্তু ও ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। পবিত্র-অপবিত্র দুটি বিষয় নির্ভর করে আছে ব্যক্তির মনন ও চিন্তার উপর। **পবিত্র (Sacred)** হল সেইসব কিছু যা মানুষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ও শ্রদ্ধার বিষয়। বস্তুর ধারণা, বিশ্বাস এবং আচার-অচরণের সমন্বয়ে পবিত্র গঠিত। পবিত্র বলতে বোঝায় পবিত্র বস্তু ও সেই সংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সমাহার যেগুলিকে দৈনন্দিন জীবন থেকে আলাদা করা যায়। পবিত্র বিষয়গুলিই ধর্মের এলাকা। যা কিছু পবিত্র সেগুলি ব্যক্তি চেতনায় সমগ্রকের ধারণার প্রকাশ ঘটায় এবং সমাজের নৈতিক শক্তিকে ধর্মীয় প্রতীক রূপে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর বন্ধন ঘটায়। পবিত্র বিষয় সমাজের সাথে যুক্ত।

অপবিত্র (Profane) হল মানুষের দৈনন্দিন পার্থিব জীবনের সাথে যুক্ত বিষয়। যা কিছু ঘটনা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত যেমন—তাদের পেশা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার সেইগুলি সবই অপবিত্র। অপবিত্র কার্যাবলী সর্বদা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। দুর্খাইম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান থাকে। এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি হল বিশ্বাস। ধর্মের ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠান এবং তাঁদের সাধারণ কার্যাবলীকে

তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১) নেতিবাচক আচার-অনুষ্ঠান (Negative Rites) : এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। ছোঁয়াছুঁয়ি ও খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কিত বিবিধ বিধিনিষেধ হল নেতিবাচক আচার-অনুষ্ঠানের উদাহরণ।

২) ইতিবাচক আচার-অনুষ্ঠান (Positive Rites) : এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান ভাবের আদান-প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩) সন্তুষ্টিকরণ আচার-অনুষ্ঠান (Piacular Rites) : এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পূজা-অর্চনার সাথে যুক্ত।

নেতিবাচক, ইতিবাচক বা সন্তুষ্টিমূলক যে কোন আচার-অনুষ্ঠানের প্রধান কাজ হল সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমাজে বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখা।

দুর্খাইম নতুন ধর্ম এবং নতুন দেবতার উদ্ভব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রয়োজনের তাগিদে সমাজে সৃষ্টি হতে পারে নতুন ধর্ম ও দেবতার। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উল্লাস-উত্তেজনাপূর্ণ বিবিধ ক্রিয়াকর্মে সামিল হয়ে আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন মানুষ নিত্যদিনের প্রাত্যহিক পার্থিব অভিজ্ঞতার পরিধিকে অতিক্রম করে যায়। মানুষের এমনই এক মগ্ন ও পবিত্র আবেশে আচ্ছন্ন অবস্থায় নতুন ধর্ম ও দেবতার উদ্ভব হয়। এভাবে সমাজে নতুন ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি হয়ে চলে। সমাজ তার প্রয়োজন মতো দেবতা ও ধর্মের সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ হল ধর্মের মূল কাজ।

সারণী : পবিত্র ও অপবিত্রর মধ্যে পার্থক্য

পবিত্র (Sacred)	**অপবিত্র (Profane)**
যা সাধারণের বাইরে বা অসাধারণ	যা নিতান্ত স্বাভাবিক, সাধারণ
ব্যক্তির অন্তর্জগতের বিষয়	বহির্জগতের বিষয়
মনোভাবে : বিস্ময়, রহস্যময়,	মনোভাবে : স্বাভাবিকভাবে আমরা যা
অতি প্রাকৃতিক	গ্রহণ করতে পারি, প্রাকৃতিক
আকাঙ্ক্ষিত ও শ্রদ্ধার বিষয়	দৈনন্দিন পার্থিব জীবনের সাথে যুক্ত বিষয়
সমাজের সাথে সম্পর্কিত	ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত

৪.৪ সারাংশ

কোঁত-এর প্রত্যক্ষবাদী ধ্রুববাদী দর্শন (positivism) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্খাইম সমাজ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ন ও আলোচনায় বিজ্ঞান নির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগে যত্নবান হন। পূর্বসূরীদের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অবরোহী পদ্ধতি বর্জন করে দুর্খাইম সমাজের প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা (Social Fact) হিসাবে চিহ্নিত করেন যাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (National Science) এর মতো যুক্তিনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ভাবনা হিসেবে সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এমিল দুর্খাইম ফরাসী দেশের এক গভীর সঙ্কটকালীন সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হয়ে ওঠেন। দেশের অবস্থার ছাপ তার লেখায় সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। ফরাসী দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তখন শিল্পায়ন কাম্য ছিল এবং শিল্পায়ন সূত্রে শ্রমবিভাজন অবশ্য গ্রহণীয় তাই দুর্খাইম শ্রমবিভাজন সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

দুর্খাইমের প্রথম বৃহৎ অভিসন্দর্ভ (Dissentation) হল সমাজে শ্রমবিভাজন (The Division of Labour in Society)। দুর্খাইম বিশ্বাস করতে যে শ্রমবিভাজন ব্যক্তির পছন্দের উপর নির্ভরশীল নয় বরং মূলত সমাজের পরিকাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। দুর্খাইম সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তা বোঝাবার জন্য সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একাত্মতা সংহতির মাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শ্রমবিভাজনের দিক থেকে দুর্খাইম সামাজিক সংহতিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈব সংহতি। যান্ত্রিক সংহতি হল সাদৃশ্যের সংহতি। এইরকম সংহতি উপজাতি ও আদিম সমাজে দেখা যায়। সেখানে যন্ত্রের মতো প্রতিটি সদস্য একই রকম কাজ করেন এবং তাদের মধ্যে মিল বর্তমান। ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই এই সমাজে। এই রকম সমাজকে খণ্ডিত সমাজ বলা হয়। অন্যদিকে জৈব সংহতি হল বৈসাদৃশ্যের সংহতি। এই রকম সংহতি আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে দেখা যায়। যেখানে জীবদেহের প্রতিটি অংশ যেমন একে অপরের উপর নির্ভরশীল থেকে শরীরকে পরিচালিত করছে তেমনই জৈবিক সংহতি সম্পন্ন আধুনিক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রমবিভাজনের মধ্যে দিয়ে একে-অপরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে যুক্ত হয়। এই ধরনের সমাজকে বিশেষিকৃত সমাজ বলেছেন তিনি।

শ্রমবিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে দুর্খাইম আইনের সামাজিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। যান্ত্রিক সংহতি সম্পন্ন আদিম, উপজাতি সমাজে যৌথ ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করার জন্য শাস্তির প্রকৃতি নিপীড়নমূলক এবং আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে আইন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু ব্যক্তির অধিকারকে পুনর্বহাল করা তাই উৎক্ষেপনমূলক আইন দেখা যায়। এই ধরনের সমাজে সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা হয়।

যান্ত্রিক সংহতি থেকে জৈবিক সংহতিতে উত্তরণের পিছনে দুর্খাইম কিছু সমাজতাত্ত্বিক চলককে

চিহ্নিত করেছেন—জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বস্তুগত ঘনত্ব, নৈতিক ঘনত্ব শ্রমবিভাজনের দুটি অস্বাভাবিক রূপ—নৈরাজ্যমূলক শ্রমবিভাজন, বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাজন এর কথাও আলোচনা করেছেন।

দুর্খাইমের দ্বিতীয় বৃহৎ সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ হল The Rules of Sociological Method। প্রথম গ্রন্থে তার লক্ষ্য ছিল সমাজতত্ত্বে কি বিষয় পড়ব তা নির্দ্ধারণ করা কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে সমাজতত্ত্ব বিষয়টি কিভাবে পড়ব অর্থাৎ পদ্ধতি কি হবে তা আলোচনা করেন। দুর্খাইমের The Rules of Sociological Method গ্রন্থে মূল বক্তব্য ছিল যে সমাজতত্ত্বকে সামাজিকভাবে ব্যাখ্যায়িত করা এবং তার জন্য বিজ্ঞান নির্ভর পন্থা অনুসরণ করা। সমাজতত্ত্বের পক্ষে স্বাধীন এবং স্বশাসিত মর্যাদা অর্জন করার জন্য প্রথম থেকে সমাজিক বস্তুসত্য (Social fact) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। তিনি মনে করতেন সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা (Social fact)গুলি হল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের (Sur generis), ব্যক্তিচেতনার বহির্ভূক্ত (Exterior), ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা (Contraint) বিস্তারে সক্ষম এবং সামাজিক ঘটনাগুলি স্বাধীন (indipendent) ভাবে সমাজে অবস্থান করে। দুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যের সঠিক প্রকাশ ঘটে গোষ্ঠীর মধ্যে। সামাজিক ঘটনাগুলি কেন্দ্রাভিগ (Centripital) হওয়ায় বাইরে থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। ব্যক্তি উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম, সামাজিক ঘটনাবলীর বহির্গত অস্তিত্বের (Objective) জন্য সমাজে মানুষের মধ্যে যৌথ বিবেক ও যৌথ চেতনা গড়ে ওঠে যার ফলে সমাজের মূল্যবোধগুলির যৌথ উপস্থাপনা (Collective representation) ঘটে। দুর্খাইম সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনার ধারণার মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের স্বাধীন ও স্বশাসিত মর্যাদা অর্জন করতে যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

দুর্খাইমের তৃতীয় গ্রন্থ "Suicide" এ আত্মহত্যা নামক সামাজিক ঘটনার সামাজিক কারণ নির্দেশ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত আচরণ বলে মনে হলেও দুর্খাইম এটিকে সামাজিক ঘটনা বলে প্রমাণ করেন। দুর্খাইম আত্মহত্যার চারটি ধরনের কথা বলেন সামাজিক সাযুজ্য (intigration) এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (regulation) উপর ভিত্তি করে। এই চার ধরনের আত্মহত্যা হল—আত্মকেন্দ্রীক আত্মহত্যা পরার্থে আত্মহত্যা, নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা এবং অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা। গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির সাযুজ্যের অভাবে আত্মকেন্দ্রীক আত্মহত্যা ঘটে এবং গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অতিরিক্ত সাযুজ্যের ফলে পরার্থে আত্মহত্যা ঘটে। পরার্থে আত্মহত্যা আবার তিনভাগে বিভাজিত—বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক এবং উগ্রপ্রকৃতির। সমাজে নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে আত্মহত্যা ঘটে তা হল নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা এবং নিয়ন্ত্রণের আধিক্যের ফলে যে আত্মহত্যা ঘটে তা অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা। এই চার ধরনের আত্মহত্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দুর্খাইম দেখিয়েছেন যে আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত বিষয় হলেও এর কারণগুলি অবশ্যই সামাজিক।

দুর্খাইমের লেখা সর্বশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The Elementary Forms of Religious Life'এ দুর্খাইম ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুর্খাইমের মতে, ধর্ম হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি একটি

সামাজিক ঘটনা বা বস্তুসত্য যা মানুষের জীবনের অনেকাংশ জুড়ে আছে। ধর্ম হল পবিত্র বস্তুর সম্পর্কিত কতগুলি বিশ্বাস ও প্রথা। ধর্ম সামাজিক সংহতি ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে। দুর্খাইমের মতে, যাবতীয় ঘটনাবলীকে ধর্ম দুই ভাগে ভাগ করে—পবিত্র এবং অপবিত্র। পবিত্র (Sacred) হল সেইসব কিছু যা মানুষের এবং সমাজের সাথে যুক্ত কাজে আকাঙ্ক্ষিত ও শ্রদ্ধার এবং পবিত্র বিষয়গুলিই ধর্মের এলাকা অপবিত্র হল মানুষের দৈনন্দিন পার্থিক জীবনের সাথে যুক্ত বিষয়। অপবিত্র কার্যাবলী ব্যক্তির সাথে যুক্ত। দুর্খাইম টোটেমের ধারণার মধ্যে দিয়ে ধর্মকে সামাজিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার অরুন্টা উপজাতিদের টোটেমের উপর বিশ্বাস তাদের কিভাবে সামাজিক সংহতি বজায় রাখে তা দেখেছেন। টোটেম প্রথা এক পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। দুর্খাইম বলেছেন টোটেম প্রথা কিছু পশু-পক্ষী, বস্তুর উপাদান নয় বরং এক ধরনের নামহীন ও বিষয়গত শক্তির উপাসনা, যে শক্তি যা কুলগোষ্ঠীর (Clan) এর প্রতীক হিসেবে সামাজিক সংহতি বজায় রাখে। দুর্খাইমের মতে, প্রয়োজনের তাগিদে সমাজে নতুন ধর্ম এবং দেবতার সৃষ্টি হতে পারে। সমাজ তার প্রয়োজনমতো দেবতা ও ধর্মের সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ হল ধর্মের মূল কাজ।

৪.৫ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন: (৬)

১) শ্রম বিভাজন কি? যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈবিক সংহতির মধ্যে পার্থক্য কি?

২) শ্রম বিভাজনের কারণ কি?

৩) শ্রম বিভাজনের অস্বাভাবিক রূপ কি?

৪) সামাজিক বস্তুসত্য কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৫) সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনার প্রকারভেদগুলি কি কি?

৬) আত্মহত্যা কি? আত্মহত্যার ধরন কি কি?

৭) ধর্ম কি? পবিত্র এবং অপবিত্র বলতে কি বোঝায়?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন: (১২)

১) দুর্খাইমের শ্রমবিভাজন তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২) দুর্খাইমের পদ্ধতিবিদ্যা আলোচনা করুন।

৩) দুর্খাইমের আত্মহত্যার তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৪) ধর্ম সংক্রান্ত দুর্খাইমের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

গ) **টীকা লিখুন : (২০)**

১) শ্রমবিভাজন

২) আত্মহত্যা

৩) সামাজিক বস্তুসত্য

৪.৬ উত্তরমালা

ক) ১) শ্রমবিভাজন হল গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রমের বিভাজিত রূপ যার দ্বারা সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। শ্রমবিভাজনের দিক থেকে দুর্খাইম সামাজিক সংহতিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন— যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈবিক সংহতি। যান্ত্রিক এবং জৈবিক সংহতির পার্থক্যের ভিত্তিগুলি হল—কাঠামোগত, প্রথাগত এবং যৌথ চেতনার বৈশিষ্ট্যগত।

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি— নগর সমূহের প্রসার —যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

৩) নৈরাজ্যমূলক শ্রমবিভাজন—বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাজন

৪) সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা নিজস্ব বা অনন্য ধরনের বাস্তবতা—একটি সামাজিক ঘটনা অন্য সামাজিক ঘটনার ফল।

বৈশিষ্ট্য—স্বয়ংসিদ্ধ; ব্যক্তিচেতনার বহির্ভূত; ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তার করে; স্বাধীন

৫) স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনা—বিকারগ্রস্থ সামাজিক ঘটনা—বস্তুগত সামাজিক ঘটনা—অবস্তুগত সামাজিক ঘটনা

৬) আত্মহত্যা হল প্রতিটি মৃত্যু, যিনি মারা গেলেন তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পাদিত কাজ। সেটি ইতিবাচক বা নেচিবাচক হতে পারে।

ধরন—আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা—পরার্থে আত্মহত্যা—নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা—অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা

৭) ধর্ম হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা (Social Fact) পবিত্র মূলত সমাজের সাথে সম্পর্কিত, আকাঙ্ক্ষিত ও শ্রদ্ধার বিষয়; অপবিত্র মূলত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, দৈনন্দিন পার্থিব জীবনের সাথে যুক্ত।

খ) ১) ৪.৩.১ দেখুন

২) ৪.৩.২ দেখুন

৩) ৪.৩.৩ দেখুন

৪) ৪.৩.৪ দেখুন

গ) ১) ৪.৩.১ দেখুন

২) ৪.৩.২ দেখুন

৩) ৪.৩.৩ দেখুন

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Abraham, F & Mongan, J 1985. Sociological Thought. Delhi: Macmillan.

২. Aron, Raymond. 1970 Main Currents in Sociological Thought. New York: Doubleday

৩. Coser, Lewis A. 1996. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought. Jaipur: Rawat Publications.

৪. Morrison, Ken. 2006. Marx, Durkheim, Weber—Formations of Modern Social Thought. New Delhi: Sage.

৫. দত্তগুপ্ত, বেলা. ২০১২. সমাজবিজ্ঞান: ওগুস্ত কঁৎ থেকে কার্ল মার্কস. কলেজ স্ট্রিট: প্রগতিশীল প্রকাশক

৪ সারাংশ

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমাজতত্ত্বের উৎপত্তি এবং বিকাশে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় যে সব মানুষ সমাজ সংক্রান্ত দার্শনিক, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ ফরাসী দেশের মানুষ। সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনে ফরাসী দেশকেই অগ্রগণ্য বলা যায়। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির চিন্তানায়কেরাও এবিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। ফরাসী চিন্তাবিদ অগাস্ত কোঁত সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে পরিচিত। ফরাসী চিন্তাবিদ অগাস্ত কোঁতের গুরু সাঁ সিমো (Saint Simon) সমাজবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞানের সমান মর্যাদাসম্পন্ন এক বিজ্ঞান হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা সমাজের সকল স্তরকে, পরিস্থিতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা যাবে, অগাস্ত কোঁত মূলত তাঁর গুরুর ধারণাকে মূর্তরূপ দানের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর সমাজ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের নাম দেন সামাজিক পদার্থবিদ্যা যার নাম বদলে পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্ব (Sociology) করেন। কোঁতের সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'প্রত্যক্ষবাদ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোঁতের সমাজ পুনর্গঠনের তাত্ত্বিক ভাবনার প্রণালীবদ্ধ রূপ হল প্রত্যক্ষবাদ। কোঁত সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ও পর্যায়ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন তাঁর সামাজিক বিবর্তন ও প্রগতির তত্ত্ব দ্বারা। এছাড়াও তিনি সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় জটিল হিসাবে বর্ণনা করে সমাজতত্ত্বকে "বিজ্ঞান সমূহের বাণী" বলে উল্লেখ করেছেন। ১ নং এককে অগাস্ত কোঁতের বিভিন্ন তত্ত্বের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোঁতই প্রথম সমাজবিজ্ঞানী যিনি সমাজদর্শন থেকে সমাজতত্ত্বকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি স্বষ্টভাবে দেখান যে প্রাকৃতিক ঘটনার মতো সামাজিক ঘটনাকেও বিষয়গতভাবে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব। কিন্তু অগাস্ত কোঁতের পরবর্তী ইংল্যাণ্ডের চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিবর্তবাদী এবং সমাজতাত্ত্বিক। তাঁর বিবর্তন তত্ত্বে সামাজিক এবং জৈবিক বিবর্তনের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি মনে করতেন যে, জীবজগতের বিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক বিবর্তনও একটি স্বাভাবিক ঘটনা। স্পেনসার যেমন বিবর্তনবাদী, তেমনি তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন যে, সমাজকে জীব হিসাবে গণ্য করার অর্থ হলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে নস্যাৎ করে সমাজের সার্বিক একতার উপর জোর দেওয়া। এই স্ববিরোধিতার কারণে পরিণত বয়সে স্পেনসার বারবার বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয়, তা জীবদেহের অনুরূপমাত্র। এই কারণে তাঁর তত্ত্বকে জৈববাদ না বলে 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ' বলাই ঠিক। এককে স্পেনসারের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র এবং বিষয়মূলক বিজ্ঞানের রূপদানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারী ফরাসী বিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম। কোঁতকে সমাজতত্ত্বের প্রথম

পরিচয়দানকারী বলে মনে করা হয় এবং দুর্খাইমকে এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের রূপ দেওয়ার ধারণার জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম সমাজতত্ত্বকে ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র থেকে পৃথক করেন। তিনি সমাজতত্ত্বকে তুলনামূলক চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চলে তাঁর সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা (Social fact) এর ধারণা সমাজতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক রূপ পেতে সাহায্য করেছে। ৪নং এককে দুর্খাইমের বিভিন্ন তত্ত্ব— শ্রমবিভাজন, আত্মহত্যা, ধর্ম-এর সামাজিক চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর তত্ত্বে মূলত ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি উঠে এসেছে। শ্রমবিভাজন প্রসঙ্গে মূলত সামাজিক ঐক্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আত্মহত্যা নামক ব্যক্তিগত বিষয়কে সামাজিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সমাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে কোঁত, স্পেনসার, দুর্খাইমের তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যে সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল তার সাথে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের কোন সংযোগ তেমনভাবে দেখা যায় না। শুধুমাত্র কোঁতের মতো মার্ক্স তাঁর ইতিহাস দর্শনের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজের বিবর্তনের কথা বলেছেন—এছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কোঁত বা তাঁর উত্তরসূরীদের সঙ্গে মার্ক্সের তত্ত্বের মিল নেই বললেই চলে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী এককথায় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। মার্ক্সের মতে, জগৎ ও জীবনের গতিপ্রকৃতি দ্বান্দ্বিক সূত্রে বাঁধা। দ্বন্দ্বের অর্থ হল সংঘাত ও মিলনের এক অবিরাম প্রক্রিয়া। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ সম্ভব ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী মানব সমাজের বিবর্তনের মাধ্যমে। এই বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ। এই বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়কে এক একটি উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত মৌলিক দ্বন্দ্বকে শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন এবং ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন। মার্ক্সের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা ৩নং এককে করা হয়েছে। ১, ২, ৩, এবং ৪নং একক পাঠের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজের পঠন-পাঠন ও নির্মাণে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ অগাস্ত কোঁত, হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল মার্ক্স এবং এমিল দুর্খাইমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভব হবে।

৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Abraham, F & Mongan, J 1985. Sociological Thought. Delhi: Macmillan.

২. Aron, Raymond. 1970 Main Currents in Sociological Thought. New York: Doubleday

৩. Coser, Lewis A. 1996. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought. Jaipur: Rawat Publications.

৪. Morrison, Ken. 2006. Marx, Durkheim, Weber—Formations of Modern Social Thought. New Delhi: Sage.

৫. দত্তগুপ্ত, বেলা. ২০১২. সমাজবিজ্ঞান: ওগুস্ত কঁৎ থেকে কার্ল মার্কস. কলেজ স্ট্রিট: প্রগতিশীল প্রকাশক

৬. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল. ২০০১. মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৭. ঘোষ, শান্তনু. ২০০২. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা. কলেজ স্ট্রীট: চ্যাটার্জী প্রকাশক

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ. ১৯৯৮. মরিস কন্‌ফোর্থ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ: একটি পরিচায়ক আলোচনা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

Notes